অনীক

মে ২০১২
বর্ষ ৪৮ q সংখ্যা ১১

সম্পাদকীয় q ১

ঘটনাপ্রবাহ
নোনাডাঙা q শমীক চক্রবর্তী q ২
বাথানিটোলার 'বিচার' q ধারা চট্টোপাধ্যায় q ৫
ভদ্রেশ্বর থানায় ধর্ষণ : এপিডিআর প্রতিবেদন q ৬
গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে একটি আবেদন q ১০

শতবর্ষে স্মরণ
শতবর্ষে ডাঃ বিজয় বসু q দীপংকর চক্রবর্তী q ৩২
ভারত-চীন মৈত্রী : ফিরে দেখা q ডা. বিজয় বসু q ৩৪

প্রবন্ধ
সিপিআই(এম)-এর মতাদর্শ q প্রবীণ রায় q ১৩
আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দেবার দায় q নব দত্ত q ২৩
মমতা সরকারের নয়া জমি আইন q প্রণব দে q ২৮

কবিতা/গান
মেঘপরীদের গান q রাজেশ দত্ত q ১১
রি-থিংকিং-এ যাঁরা নিবিষ্ট... q বিশ্বজিৎ সেন q ১১
ঠাঁই q সব্যসাচী গোস্বামী q ১২
ছড়া q সৃজন সেন প্রভৃতি q ১২

পাঠকের কলমে q ৪০

যোগাযোগ, লেখা, চিঠিপত্র ও
টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩২৮৭৭৫৬০
গ্রাহকদের যোগাযোগ : ৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১১, রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা ৭০০ ০০৯
(মঙ্গলবার : সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা)

সম্পাদকমণ্ডলী : **দীপংকর চক্রবর্তী রতন খাসনবিশ সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব**

সম্পাদকীয়

জ্ঞানীরা যখন থমকে দাঁড়ায়, মূর্খরা দেয় ঝাঁপ!

অবশেষে জাপানও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে এলো। হ্যাঁ, সেদেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথাই বলছি। যে দেশের মানুষ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণের ভয়াবহতা জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই জাপানের ফুকুশিমায় গত বছরের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিস্ফোরণের ফলে অজস্র মানুষের মৃত্যু ও অন্তত লাখ খানেক মানুষের বিপন্নতা নতুন করে এধরণের পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপদ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে দিয়েছিল। সেদেশের মানুষ আর চুপ করে থাকেন নি, প্রতিবাদে নেমে পড়েছিলেন, সমস্বরে দাবি তুলেছিলেন : সারা দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করো! নানারকম অজুহাত, টালবাহানা ও দেশি-বিদেশি কায়েমি স্বার্থের বিরোধিতা সত্বেও অবশেষে সেদেশের সরকার পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করে তাপবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ ও নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের উপর নির্ভর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলত আনন্দের বান ডেকেছে জাপানের ব্যাপক মানুষের মধ্যে।

এই প্রসঙ্গেই মনে রাখা দরকার যে, জাপানই হচ্ছে একটিমাত্র দেশ, যেটা ভৌগোলিকভাবে তৃতীয় দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলেও, সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে অনেক এগিয়ে, ইউরোপ-আমেরিকার উন্নত দেশগুলির সমগোত্রীয়। আর প্রযুক্তিগত দক্ষতার বিচারে সে দেশের উচ্চ মানের কথা তো সর্বজনবিদিত। আর শুধু জাপানই তো নয়, এখনও পর্যন্ত যে সব উন্নত দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয় নি, সেই সুইজারল্যান্ড, জার্মানি প্রভৃতি তো বটেই, এমনকি এর পক্ষে সবচেয়ে সোচ্চার যে দেশ, সেই ফ্রান্স পর্যন্ত কয়েক দশক আগের চের্নোবিলের পর সাম্প্রতিক ফুকুশিমার বিভীষিকায় বিচলিত হয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছে। আর দুনিয়ার অধিকাংশ পারমাণবিক বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপদের কথা চিন্তা করে এর বিরোধিতা করছেন।

আর আমাদের দেশ ভারতবর্ষ? শাসকবর্গের হাজার বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও মানব উন্নয়ন সূচকের বিচারে যে দেশের অবস্থান সারা পৃথিবীতে পিছনের দিকে, তাদের কিন্তু এখনও পর্যন্ত চৈতন্যোদয়ের সামান্যতম লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। বরং তামিলনাড়ুর কুদানকুলামে প্রস্তাবিত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ শুরুর তোড়জোড় চলছে মহাসমারোহে। সেখানকার হাজার হাজার মানুষ, বিশেষত মৎস্যজীবীরা নিজেদের জীবন ও জীবিকার স্বার্থে যে ব্যাপক আন্দোলন সেখানে গড়ে তুলেছেন তার বিরুদ্ধে, তার উপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাষ্ট্রশক্তি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ তো কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই এই আন্দোলনের পিছনে 'অদৃশ্য হাত' আছে বলে নির্লজ্জ কুৎসায় মেতেছেন, এবং আন্দোলনকারীরা সঠিকভাবেই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। ভারতীয় শাসকবর্গের এই জনস্বার্থ-বিরোধী অবস্থানকে কিন্তু 'জ্ঞানীরা যখন থমকে দাঁড়ায়, মূর্খরা দেয় ঝাঁপ!' বলে ব্যঙ্গ করলেই পুরো ছবিটা ধরা পড়বে না—বরং মনে রাখতে হবে এদেশের অর্থনৈতিক পন্থার মূল নিয়ামক মনমোহন-আলুওয়ালিয়া-চিদাম্বরম প্রভৃতিদের সাথে তাদের ভাই-বেরাদার দেশি কর্পোরেটমহল এবং নেপথ্যের বাজীকর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তথা মার্কিন শাসকশ্রেণীর স্বার্থের নিবিড় বন্ধনের কথাও।

নোনাডাঙা

শমীক চক্রবর্তী

কলকাতার পূর্বপ্রান্ত ধরে যে নীচু জলাজমি ছিল, এককালে যা ছিল কলকাতার স্বাভাবিক জলনিকাশির রাস্তা, বিস্তীর্ণ ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের ধার ধরে সেই বিস্তীর্ণ এলাকায় নগরায়নের নামে তৈরী হয়েছে বড় বড় ফ্ল্যাটবাড়ি, শপিং মল, বেসরকারি হসপিটাল। নোনাডাঙ্গা এলাকাটা এসবের পিছনের সারিতে ছিল। এখন তারও পিছনে গড়ে উঠতে শুরু করেছে আর্বান এনআরআই টাউনশিপের মত প্রজেক্ট। বাইপাস থেকে চওড়া সোজা রাস্তা চলে যাচ্ছে হেরিটেজ স্কুল-কলেজের পাশ দিয়ে কলকাতা-বাসন্তী স্টেট হাইওয়ের দিকে। তাই নোনাডাঙ্গার মত এলাকা আর শহরের প্রান্ত নয়, শহরের জমি-মাফিয়াদের শ্যেনদৃষ্টিতে এসে পড়া লোভনীয় এলাকা। এককালে এই নোনাডাঙ্গা এলাকার জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে যা চিহ্নিত হয়েছিল পুনর্বাসন এলাকা হিসেবে। শহর কলকাতায় খালপাড়গুলো থেকে, রেলস্টেশনের ধার থেকে, বস্তিগুলো থেকে যারা উচ্ছেদ হবে তাদের ঠাঁই হবে এই নোনাডাঙ্গার মত এলাকায়। বাইপাসের পূর্বপাড়ে এরকম চিহ্নিত এলাকা আরও ছিল, যদিও নগরায়নের গ্রাসে সেসব এলাকা মেট্রোপলিটন শহরের দুর্মূল্য জমির অংশই হয়ে উঠেছে। নোনাডাঙ্গাতে সরকারি পুনর্বাসন প্রকল্পের ফ্ল্যাট পান প্রথম দিকের উচ্ছেদ হওয়া মানুষরা। তারপর শহর থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষ, গ্রামের জীবন-জীবিকা থেকে উৎখাত হওয়া মানুষ ক্রমে ক্রমে ভাসতে ভাসতে এসে পৌঁছেছেন এখানে, যদিও যত দিন গেছে ততই কমে এসেছে পুনর্বাসনের হার। আর সে পুনর্বাসনেরও যা নমুনা! জলের ব্যবস্থার ঠিক নেই, বাজার নেই, স্কুল নেই, স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই, আছে শুধু ১৬০ স্কোয়ার ফুটের একটা খুপড়ি ফ্ল্যাট, যার দলিলপত্রের আবার কোন ঠিকঠিকানা নেই। ক্রমে ক্রমে মানুষই গড়ে তুলতে চেয়েছে তাঁদের বাঁচার রসদগুলো। আর ফ্ল্যাটের পাশাপাশি গড়ে উঠতে থেকেছে একের পর এক ঝুপড়ির ঘর— বস্তি এলাকা। এরকম একের পর এক গড়ে ওঠা বস্তির মধ্যে শেষে সংযোজিত হয়েছিল মজদুর পল্লী ও শ্রমিক কলোনির নাম, যা এখন আলোচনার কেন্দ্রে।

'পরিবর্তনের' এক বছর পেরোনোর আগেই এরাজ্যের নতুন শাসকদলের রাজ্যপাটে ক্রমশ দুঃসহ হতে থাকা পরিস্থিতিতে অন্য মাত্রা যোগ করলো নোনাডাঙ্গার এই বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। ঘটনাক্রমগুলো এখন মোটামুটি সবারই জানা। ৩০ শে মার্চ মজদুরপল্লী ও শ্রমিক কলোনির তিল তিল করে গড়ে তোলা শ'দুয়েক ঘরের কান্না-আর্তনাদকে অবলীলায় অবজ্ঞা করে সরকারি পে-লোডার আর দাউদাউ আগুন ভেঙ্গে-গুঁড়িয়ে ছাই হয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল বেড়া-দরমা-বাঁশ-ফ্লেক্সের তৈরী ঘরগুলোকে। প্রতিরোধের চেষ্টা করেও সেদিন সরকারি আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারেননি সেখানকার বাসিন্দারা। কিন্তু তারপর অন্য ইতিহাস তৈরি হয়েছে। একের পর এক প্রতিবাদ মিছিলে লাঠিচার্জ, শান্তিপূর্ণ অবস্থান থেকে গণ-গ্রেপ্তার করে বেছে বেছে আন্দোলনের কয়েকজন সংগঠককে মিথ্যে কেস দেওয়া, তারপর একের পর এক মিছিল-প্রতিবাদে পুলিশ-প্রশাসনের প্রতিবন্ধ-গ্রেপ্তার, এপিডিআরের মিছিলের ওপর শাসকদলের গুন্ডাদের হামলা এবং এরকম প্রত্যেকটা পদক্ষেপে প্রতিবাদ দ্বিগুণ হয়ে ওঠা। ওদিকে ১২ দিন ধরে অনশনের মধ্যে দিয়ে একদিকে অস্থায়ী ঘরগুলোর পুনর্গঠন, আর তার সাথে প্রকৃত পুনর্বাসনের দাবিকে সামনে রেখে এখন লড়াই চলছে। অন্যদিকে কেএমডিএ-এর পক্ষ থেকে টিনের ঘেরা লাগানো, এবং তারপর পাঁচিল ঘেরার কাজ চলছে, সরকারি নির্মমতা এমনই যে ওই বস্তিবাসীদের প্রায় কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মত ভিতরে আটকে দেওয়া চলছে। সেই টিনের ঘেরা লাগানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে গ্রেপ্তার হয়ে যান ১১ জন বস্তিবাসী। পাঁচ দিন পুলিশ হাজতে থাকার পর তাঁরা যখন জামিনে মুক্তি পান, তখন জামিন বাবদ দিতে হয়েছে মাথাপিছু ৫০০০ টাকা। অন্যদিকে সরকারের ঝুলি থেকে বেড়াল ক্রমশ বেরোচ্ছে। যেটুকু তথ্য নানাভাবে, এমনকি কেএমডিএ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ওই অঞ্চলের বিরাট এলাকার জমি যে নিলামে চড়ানো হয়েছে, কলকাতাকে লন্ডন বানানোর যজ্ঞে বলিপ্রদত্ত হয়েছে বা হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেএমডিএ-এর ওয়েবসাইট অনুযায়ী নোনাডাঙায় তাদের হাতে ৮০ একরের মত খালি জমি (কিছু জলাজমি সহ) আছে, যা তারা ৯৯ বছরের জন্য বেসরকারি উদ্যোগকে লিজ দিতে চান। সেই জমিতে গড়ে তোলা হবে বহুতল বাড়ি, শপিং মল, বড়লোকদের সিনেমা হল, বিনোদন কেন্দ্র, জলকেলির পার্ক।

১৩ই মার্চ পুলিশ ও কেএমডিএ নোনাডাঙ্গা এলাকায় এসে মাইকে করে ঘোষণা করে গিয়েছিল যে, এলাকার সমস্ত বস্তিগুলোকে ভেঙ্গে দেওয়া হবে। তারপর তৎপরতার সাথে ওই সমস্ত বস্তিবাসীরা প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি, ইতিউতি কাউন্সিলর বা স্থানীয় এমএলএ-দের সাথে যোগাযোগ করে তাদের ঘর রক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতি না পেয়ে তারপর তারা যান কেএমডিএ-র দপ্তর উন্নয়ন ভবনে, পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিতে। মন্ত্রী সোজাসাপটা 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি নিলেন, কোনো কোনো বস্তিকে বললেন যে তাদের

ঘর ভাঙ্গা হবে না, কাউকে কাউকে বললেন যে তাদেরটা ভাঙ্গা হবে। যাদেরটা ভাঙ্গা হবে, মন্ত্রীর যুক্তিতে সেগুলো তুলনামূলক-ভাবে নতুন বলে ভাঙ্গা হবে। সেগুলো নাকি টাকা নিয়ে বসানো হয়েছে। এ তো সেই একই পুরনো ইতিহাস! যত বস্তি, যত কলোনি বিগত বছরগুলোতে, বিগত শতকের পুরনো দশক-গুলোতেও বসেছে, তার অধিকাংশেরই যে এটাই ইতিহাস, তা আর কে না জানে! প্রশ্নটা হল, যারা বসাচ্ছে তারা যে সরকার প্রশাসন স্থানীয় নেতা দাদাদের কৃপাধন্য, সেটা বুঝতে আর কী অসুবিধা? সেই খুঁটির জোর যদি তাদের না থাকে তাহলে টাকা দিয়ে লোক বসানোর মত বুকের পাটা তাদের আসবে কোথা থেকে? কিন্তু যারা ঘর বাঁধছে, তারা কারা?

নোনাডাঙ্গার এই মানুষরা কারা? কী করেন তাঁরা? এখানকার বেশিরভাগ মানুষ শহরের অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক। অনেকেই কর্মহীন। কাছেই কসবা শিল্প তালুকে কাজ করেন কেউ কেউ, কেউ করেন রাজমিস্ত্রির কাজ, মাটি কাটার কাজ, রিক্সা বা ভ্যান চালানো। অনেকের দোকান আছে রাস্তার পাশে (বাইপাসের ধারের দোকানগুলোর মধ্যে অনেকের দোকান ছিল, যা ভাঙ্গা পড়েছে)। এই কাজে যাওয়ার প্রশ্নে পুরুষের সাথে সাথে আছেন মহিলারাও। গৃহপরিচারিকা, ছোট কারখানায় কাজ থেকে নার্সের কাজে যুক্ত এখানকার মহিলারা। বিবাহ-বিচ্ছিন্না বা স্বামী অন্য জায়গায় থাকেন এমন অনেক কর্মরতা মহিলা থাকেন এই এলাকায়। কাজ করে বেঁচে থাকার মতো একটা মজুরি জোটানো, আর প্রত্যেকটা আগামীকাল সম্পর্কে অনিশ্চয়তা নিয়ে দিন কাটানো এখানকার মানুষদের, শহরের এইরকম মানুষদের দৈনন্দিনতা। নয়া-উদারনৈতিক ব্যবস্থার হাত ধরে সংগঠিত শিল্পে ব্যাপক ধাক্কা নেমে আসা এবং শিল্প উৎপাদনের পদ্ধতি বদলে ক্রমশ অসংগঠিত বা ইনফর্মাল সেক্টরে রূপান্তর প্রবলভাবে বদলে দিয়েছে শহরে এই শ্রমজীবী মানুষদের অসহায়তার চেহারা। লেশমাত্র কাজের এবং সামাজিক সুরক্ষা ছাড়াই এই মানুষরা তাঁদের শ্রম ঢেলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। শ্রম আইনের ব্যাপক সংস্কার, সংগঠিত শিল্পের ধ্বংসপ্রাপ্তি, ন্যূনতম বেতন থেকে শুরু করে পিএফ-ইএসআই-গ্র্যাচুইটির মত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলো দিতে সরকারের টালবাহানা বা দীর্ঘসূত্রিতা, প্রকল্পগুলোর কার্যকর রূপান্তরের অভাব দ্রুত বাড়িয়ে তুলছে শহরের বুকে এই অংশটার যন্ত্রণাকে। 'উন্নয়ন' প্রক্রিয়ার এই হিংস্র ক্ষতটাকে বহন করে চলেছে প্রত্যেকটা শহরে বস্তি। এই যন্ত্রণা এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার শৃঙ্খলে তাদের ভূমিকাই আবার তাদের শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। গ্রাম থেকে কৃষির খরচ বহন করতে না পেরে, সার-বীজ-কীটনাশকের জন্য ঋণের ফাঁদে জেরবার হয়ে গিয়ে, ক্রমশ বন্ধ্যা হতে থাকা মাটি অথবা নোনাডাঙার ক্ষেত্রে বিশেষত আয়লার মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে এদের শহর অভিমুখে যাত্রা। কেউ এসেছেন আগে, কেউ অদূর অতীতে। কেউ থাকতেন অন্য বস্তিতে, উচ্ছেদ হয়ে এসে ঘর বেঁধেছেন নোনাডাঙায়। কেউ বা বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতেন অন্যত্র, ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন-অভিমুখী শহরে বাড়িভাড়ার খরচ বহন করতে না পেরে ঘর বেঁধেছেন এখানে। আর একটা ছোট্ট অংশ আছেন যারা আগে পুনর্বাসন পাওয়া ফ্ল্যাটে থাকার জায়গার অভাবে মাঠে এসে ঝুপড়ির জীবন যাপন করতে শুরু করেছেন।

শহরের এই শ্রমজীবী অংশের মানুষের সংখ্যার তুলনায় যে দু-চারটে সরকারি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, তা নিতান্তই কম। আগের সরকারও নগরোন্নয়নের নামে উচ্ছেদের ভয়াবহ প্রকল্প চালিয়েছে, সাথে ছিল সরকারি জওহরলাল নেহেরু ন্যাশনাল আর্বান রিনিউয়াল মিশন সংক্ষেপে জেএনএনইউআরএম প্রকল্পের দাওয়াই। শহরের সৌন্দর্যায়নের নামে এই প্রকল্পের স্টিমরোলার একটা বড় পরিকল্পনাকে রূপায়ণ করতে নেমেছে, যার শরিক বড় পুঁজি, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এবং রাষ্ট্রশক্তি। '৯০-এর দশকের শুরুতে কেন্দ্রীয় সরকারের মেগাসিটি প্রকল্প এসেছে, ১৯৯৬ সালে শহরে পরিকাঠামোর বিকাশের জন্য ১০ বছরে ২২,৫০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের জন্য খুলে দেওয়া হয় ব্যক্তি পুঁজির সামনে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এডিবি), ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এবং ব্রিটিশ সরকারের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) যোগ দেয় ভারতের শহর সংস্কারের এই মৃগয়ার দিকনির্দেশে। ফলত শেষপর্যন্ত ২০০৫ সালে রূপ পায় জেএনএনইউআরএম। বিশ্বপুঁজির গ্রন্থি হিসেবে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে শুরু করে দুনিয়ার তাবৎ শহর, ভারতের শহরগুলো এবং শহর কলকাতাও। বিরাট পরিকাঠামো নির্মাণ এবং রিয়েল এস্টেট ব্যবসার পরিকল্পনা সম্বলিত এই ব্লুপ্রিন্ট কে রূপ দিতে পরামর্শদাতা হিসেবে আসে ম্যাককিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউটের মত সংস্থা। ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের রাস্তা খুলে দেওয়া হল রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রের জন্য। শহরে গরিব এবং বস্তি এলাকা তাদের পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে প্রথম অন্তরায়। এগুলোর সংখ্যা কমাতে হবে। জেএনএনইউআরএম-এর পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য বরাদ্দ টাকার ৬৫ শতাংশ দেওয়া হল আর্বান ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (ইউআইজি) খাতে, যার দায়িত্ব যাবতীয় পরিকাঠামোগত ও সৌন্দর্যায়নের কাজ। পিপিপি মডেল গ্রহণ করা হলো এর জন্য। এবং হাতে গরম ফল হলো— ২০০৭-০৮-এর পরিকাঠামোগত বাজেট ২৬০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১১-১২ সালে হলো ৫৬০ কোটি টাকা। অন্যদিকে

জেএনএনইউআরএমের বাকি ৩৫ শতাংশ টাকা বরাদ্দ করা হলো বেসিক সার্ভিস ফর আর্বান পুওর (বিএসইউপি) নামে বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন খাতে। সমস্ত পুরনো প্রকল্প বাতিল করা হলো। অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রথম ৬৫ শতাংশের কাজের প্রাধান্যের ঠেলায় বাকি ৩৫ শতাংশের কাজ হয়ে দাঁড়ালো তারই অনুসারী। ফলে যেন তেন প্রকারেণ শহরকে খালি করতে হবে, দ্রুত। তার হাত ধরে আসবে জমির দামের আকাশচুম্বী গতি, রিয়েল এস্টেট ব্যবসার রমরমা।

নোনাডাঙ্গা এলাকায় কেএমডিএ ও কেইআইপি-র হাত ধরে এই বিএসইউপি প্রজেক্টেরই রূপায়ণ দেখেছিলাম আমরা। মাথা গোঁজার মত ১৬০ স্কোয়ার ফুটের ছোট্ট ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যথাযথ কাগজপত্র পাননি সেখানকার বাসিন্দারা। নাগরিক পরিষেবার হাল বলার মত নয়। পরিশ্রুত পানীয় জল নেই, সামগ্রিক ভাবেও জলের মারাত্মক সংকট। সরকারি উদ্যোগে পড়বার মত স্কুল-কলেজ নেই, চিকিৎসাকেন্দ্র বা হাসপাতাল নেই। পুনর্বাসনের নামে এই নির্বাসনের জীবনে গিয়ে পড়লেন যে মানুষরা, অথবা পরে ওই এলাকায় বস্তি গড়ে যারা থাকতে শুরু করলেন, তারা শহরের প্রান্তিকতম মানুষ। সস্তা শ্রমের আড়ত সেখানে, আড়তদারের বেশে স্থানীয় দালাল-ব্যবসায়ী-প্রমোটার-রাজনৈতিক নেতা বা ডনরা। দারুন শ্রমে পাওয়া সামান্য রোজগারেও যাদের ভাগ আছে। এখানে আইনি কিছুই নেই। কোথায় শ্রম আইন, কোথায় ন্যূনতম মজুরি, আর কোথায় বাসস্থান-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধিকারের গালভরা বুলিগুলো?

আন্দোলন শুরু হয়েছিল উচ্ছেদের আগেই। আমরা, বিভিন্ন গণআন্দোলনের কর্মীরা, যারা ওই এলাকায় এর আগেও নানা সামাজিক কাজকর্ম ও নাগরিক পরিষেবার দাবিতে বা উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলাম, তারা উচ্ছেদের ঘোষণার পরেই এবিষয়ে তৎপর হই, ওখানকার মানুষদের নিয়ে গড়ে ওঠে উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হতে শুরু করে ওই ব্যানারে। এর অব্যবহিত আগেই বাইপাস জুড়ে ব্যাপক পরিমাণে দোকান-বাজার-হকার উচ্ছেদ হয়, এর আগের জমানার উচ্ছেদ অভিযানের আতঙ্ক এখনো ধুয়েমুছে যায়নি। সেসব স্মরণ করিয়ে দিয়ে পোস্টার ছাপা হয়। মন্ত্রীর আশ্বাসের বাণী যাদের কৃপা করেনি, সেরকম তিনটি বস্তির মানুষরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে সফল করতে থাকে প্রতিবাদী প্রচার ও মিছিলগুলোকে। বস্তিগুলোর মানুষরা এর আগে 'পরিবর্তনের' সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর ভূমিকা নিয়েছেন, তাদের কেউ কেউ শাসকদলের কৃপাপ্রত্যাশী হয়ে, নানা জায়গায় ঘুরে জুতোর সুকতলা ক্ষইয়ে ফেললেও কোন ফল না মেলায়, অভিমান আর দ্বিধা বুকে নিয়ে সামিল হতে থাকেন আন্দোলনে। ৩০শে মার্চ ঘর ভাঙ্গার পর আর তাদের দ্বিধার কিছু অবশিষ্ট ছিল না। আর সরকারও কোনো দ্বিধা দেখালো না। বেহিসেবি লাঠিচার্জ থেকে শুরু করে নির্বিচারে গ্রেপ্তার। উচ্ছেদের বহু পরিকল্পনা যাদের রয়েছে তারা প্রথম রাতেই বেড়াল মারার বাসনায় ঝাঁপিয়ে পড়ল আন্দোলনকে দমাতে। আন্দোলন সম্পর্কে সরকারি কুৎসাগুলো নিয়ে আর এ লেখায় বিস্তারিত আলোচনায় গেলাম না। সরকার এবং সরকারের কৃপাধন্য মিডিয়াগুলোর দিক থেকে কুৎসা ও আষাঢ়ে গল্প রটানোর হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও আন্দোলনকে রোখা যায়নি। আমরা যারা এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকেছি (এবং বলাই বাহুল্য, সরকারি তরফে বহিরাগতর তকমা পেয়েছি), তারা আগের সরকারের জমানায় শহরের খালপাড় রেলকলোনি বা হকার উচ্ছেদ থেকে শুরু করে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষকদের তাদের জমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নানা মানুষ, নানা সংগঠন বিভিন্নভাবে যুক্ত ছিলাম। সেই আন্দোলনগুলোতে বর্তমান সরকারের নেত্রী ও অন্যান্যদের ভূমিকা মানুষ ভুলে যায়নি। ভুলে যায়নি তৎকালীন সরকারের দিক থেকে আন্দোলনের ওপর দমনপীড়নগুলোকেও। অথবা আন্দোলনকে ভিতর থেকে ভাঙ্গার কূটকৌশলগুলোকেও। এই সরকারও সেই একইভাবে গোড়াতেই আন্দোলনকে সমূলে বিনাশ করার জন্য ব্যাপক দমনপীড়নের রাস্তা নিয়েছিল। আন্দোলন কিন্তু তার নিজের গতিতে এগিয়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, মুখ্যমন্ত্রীকে ঘোষণা করতে হয় যে, উনি বস্তি উচ্ছেদ করবেন না। সাথে অবশ্য বলেছেন যে নোনাডাঙ্গার বিষয়টি আলাদা। এখানে বস্তিই ছিল না! সবই চক্রান্ত সরকারের বিরুদ্ধে! এই লেখা যখন ছাপতে যাচ্ছে ঠিক তার আগে নোনাডাঙ্গা এলাকার ওই জমির বাইরে দেখা গেছে সরকারি তরফে বিজ্ঞাপন টাঙানো, ওখানে গরিবদের জন্য আবাসন হবে বলে। অর্থাৎ যে এলাকায় শপিং মল, বিনোদনের জায়গা, ওয়াটার পার্ক ইত্যাদি হবে বলে সরকারি ওয়েবসাইটে বলা হয়েছিল, ৩০শে মার্চের মধ্যে যে জমি হস্তান্তরিত হয়ে যাওয়ার কথা (ওয়েবসাইট অনুযায়ী তাই হওয়ার কথা, এবং পাঠক খেয়াল করবেন যে ওই তারিখেই উচ্ছেদ হয়েছিল), আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় সেখানে রাতারাতি গরিবদের জন্য আবাসনের কথা যেভাবে ঘোষিত হল, সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে জমি নিয়ে এই দড়ি টানাটানির খেলায় গরীব খেটে খাওয়া মানুষ যদি তার হকের লড়াইকে, শহরে শ্রমজীবী মানুষের বাসস্থানের প্রশ্নটাকে আরও জোরের সাথে হাজির না করতে পারে, তার জন্য সংগঠিত না হয়, প্রকৃত বামপন্থী শক্তিগুলো যদি আন্দোলনের এই অভিমুখকে তাদের কর্তব্য বলে স্থির না করে তাহলে নিও-লিবারাল অর্থনীতির জমানায় শহরগুলোতে জমি লুঠেরাদের কব্জা যে শক্তিশালী হবে, অসংখ্য মানুষের আশ্রয়চ্যুতি অনিবার্য হয়ে উঠবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঘটনাপ্রবাহ

ন্যায়বিচার ও বাথানিটোলা

ধারা চট্টোপাধ্যায়

আজ থেকে ষোলো বছর আগে সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সামন্তবাদী শোষকদের ভাড়াটে বাহিনীর হাতে বিহারের ভোজপুর জেলার একটি ছোট্টো গণ্ডগ্রাম বাথানিটোলাতে তথাকথিত নিচু জাতির ২১জন অসহায় মানুষের শোচনীয় গণহত্যাকাণ্ডের খবরে। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৯৬-এ বিহারের ভোজপুর জেলার একটি ছোট্টো গণ্ডগ্রামে। খুনিরা সবাই ছিল 'উঁচু' জাতির সামন্তদের নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে পোষা কুখ্যাত রণবীর সেনার লোক। তাদের মূল লক্ষ্য অবশ্য ছিল ভোজপুর জেলায় চলমান জঙ্গি কৃষক লড়াইয়ের এবং সিপিআই (এম-এল) -লিবারেশনের কর্মীরা। ষোলো বছর পরে আজ দেশ আবার চমকে উঠেছে সেই বাথানিটোলার খবরে। সেখানকার হতদরিদ্র মানুষগুলো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন খুনীদের চরম শাস্তির জন্য, কেননা প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সাক্ষী দিয়েছিলেন অনেকেই। কিন্তু না, এবার তাদের সেই ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশাকে 'খুন' করলো বিহার হাইকোর্ট— জেলা আদালত খুনিদের শাস্তিবিধান করলেও, উচ্চতর আদালতের 'বিজ্ঞতর' বিচারকেরা তাদের সবাইকেই মুক্তি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কয়েকজন খুনির কাছে তারা নির্লজ্জের মতো প্রকাশ্যেই ক্ষমা চাইতে পর্যন্ত পিছুপা হন নি। একটি বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যে শোষকশ্রেণীর স্বার্থই সাধারণভাবে বিচারব্যবস্থার দেখার কথা। কিন্তু নির্লজ্জতার বিচারে ১৯৪৭-উত্তর ভারতবর্ষের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় এর চেয়ে জঘন্যতর নিদর্শন খুবই কম মিলবে।

আমাদের দেশের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রায়শই দাবি করেন, আইনের হাত নাকি ভীষণ লম্বা, যার হাত থেকে কোনো অপরাধীর নিস্তার পাবার কোনো উপায় নেই। আরও দাবি করা হয়, আইন নাকি প্রকৃতই 'নিরপেক্ষ'। এই সব বিশ্বাস ব্যাপক মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই আসলে শাসকশ্রেণীর সুবিধে হয়— যে কারণে আইনের 'নিরপেক্ষতা' নিয়ে প্রশ্ন তুললেই আদালত অবমাননার দায়ে সাজা পেতে হয়। উদাহরণ: অরুন্ধতী রায়, প্রশান্তভূষণ ইত্যাদি। কিন্তু এই নির্মম সত্যিটাকে আর কিছুতেই চেপে রাখা যাচ্ছে না যে, সাধারণত ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃত বাস্তব আসলে তার উল্টো সাক্ষ্যই দিয়ে থাকে। সম্প্রতিকালে তাই নিম্ন আদালতগুলিতে, হাইকোর্টগুলিতে, এমনকি সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত একের পর এক মেহনতি মানুষের বিপক্ষেই রায় দেবার দৃষ্টান্ত মিলছে। বাথানিটোলার নৃশংস গণহত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ২০১২-র ১৬ এপ্রিল পাটনা হাইকোর্টের রায় সেই তালিকাতেই একটি নতুন সংযোজন মাত্র।

কিন্তু মানুষ কী করে এ কথা ভুলবে যে, ১৯৯৬-এর ১১ জুলাইয়ের সেই ভয়াবহ অন্ধকার রাতে উঁচুজাতের শ্রেণীস্বার্থেই গড়ে তোলা রণবীর সেনার নৃশংস খুনিগুলি একের পর এক খুন করেছিল ২১জন মানুষকে। মৃতদের মধ্যে ছিলেন ১১জন নারী, ৬জন শিশু ও তিনটি কোলের বাচ্চা। মৃতদের মধ্যে ছিল চুড়িবিক্রেতা নইমুদ্দিন আনসারির পরিবারেরই ছ'জন। খুনিরা তার দু'মাসের কোলের বাচ্চাকে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে হিংস্র উল্লাসে তাকে বল্লমে গেঁথে ফেলেছিল।

পরের দিনই সাহার থানায় কিষেন চৌধুরী এফআইআর দায়ের করে ৩৩জনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তোলে। ১৯৯৬-র অক্টোবরে পুলিশ চার্জশিট দেয়। মোকদ্দমা চলে দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে। অবশেষে ২০১০-এ আদালতের রায় ঘোষিত হয়। তিনজন অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড ও ২০জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আদালত নইমুদ্দিন ও আরো ৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। কিন্তু ওই রায়ের বিরুদ্ধে পাটনা হাইকোর্টে অভিযুক্তরা আপিল করলে, হাইকোর্ট 'বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যের অভাবে' সবাইকেই মুক্তি দেবার নির্দেশ দেয়।

হাইকোর্টের এই স্পষ্টতই পক্ষপাতদুষ্ট রায় অনেককেই স্তম্ভিত করে দিয়েছে, চার দিকে ব্যাপক প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সবাই মনে করছেন, এই রায়ের পরিণতিতে শুধু বিহার নয়, সারা দেশেরই ক্ষীয়মান সামন্তবাদী শক্তিগুলি নতুন করে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাবে। বিগত ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকেও উঁচুজাতের শ্রেণীস্বার্থেই গড়ে তোলা হয়েছিল রণবীর সেনার মতো ভূমি সেনা, লোরিক সেনা, ব্রহ্মর্ষি সেনা, সত্যেন্দ্র সেনা, সাবর্ণ লিবারেশন ফ্রন্ট, সানলাইট সেনা প্রভৃতি। এইসব খুনি বাহিনীর লোকেরা বহু নৃশংস গণহত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে, এবং প্রতি ক্ষেত্রেই তার শিকার হয়েছে গরিব দলিত ও খুবই পশ্চাৎপদ জাতের মানুষেরা, বিশেষত নারী ও শিশুরা। শুধু লক্ষ্মণপুর (১৯৯৭), শংকরবিঘা (১৯৯৯) ও মিয়াপুরেই (২০০০) মোট ১১৬জনের মৃত্যু হয়েছে। বাথানিটোলা হত্যা-কাণ্ডের নেতৃত্ব দিয়েছিল রণবীর সেনার প্রধান পাণ্ডা ব্রহ্মেশ্বর সিং নিজে। সে ভোজপুর, জাহানাবাদ, গয়া ও ঔরঙ্গাবাদ প্রভৃতি জেলায় অন্তত ডজন খানেক গণহত্যার ঘটনা ঘটিয়েছে এবং সে কথা সে পুলিশ ও সংবাদমাধ্যমের কাছে খোলাখুলি স্বীকার করেছে। তবুও গত জুলাইয়ে সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গেছে। একইভাবে কুখ্যাত সাবর্ণ লিবারেশন ফ্রন্টের পাণ্ডা রামাঘাত সিং ওরফে ডায়মন্ড, শাওন বিঘা (জাহানাবাদ) ও বড়সিংহা (গয়া) হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও আদালতের রায়ে মুক্তি পেয়ে গেছে। বর্তমানে এই

ধরনের প্রায় সমস্ত খুনের পাণ্ডারাই মুক্ত, জেলের বাইরে। সবারই আশংকা, হাইকোর্টের রায়ে মুক্ত বাথানিটোলা হত্যাকাণ্ডের আসামীরাও এদের মতো মুক্তিই পেয়ে যাবে। অন্য দিকে বিহারের মগধ অঞ্চলে উঁচুজাতের লোকদের কৃত হত্যাকাণ্ডের 'প্রতিশোধমূলক' ডজনখানেক মৃত্যু ঘটাবার ঘটনায় 'অপরাধী' অন্তত ১৫০জন এমসিসি-কর্মী ও অন্যান্যদের ব্যাপকভাবে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজকের সোচ্চার প্রতিবাদে এই পুরোনো ঘটনাগুলি এবং আদালতে উঁচুজাতের লোকদের ব্যাপক মুক্তি পাবার ঘটনাগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখিত হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে : এই প্রবণতাটিও কি দলিত ও পশ্চাৎপদদের একধরনের সংরক্ষণ!

আজ হোক, বা কাল হোক, এই সব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু শাসকশ্রেণীকে দিতেই হবে।

সবশেষে আর একটি প্রশ্ন। এক অর্থে, বাথানিটোলা হত্যাকাণ্ডের পক্ষপাতদুষ্ট রায়ের ব্যাপারে সংবাদ-মাধ্যম বা শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সুবিধেবাদী মানসিকতা নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে। এই ধরনের ঘটনায় তারা সম্প্রতিকালে বার বার মোমবাতি নিয়ে প্রতিবাদী মিছিল করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তা কি শুধু উচ্চ বা মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে? কয়েক বছর আগে জেসিকা লালের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সর্বসমক্ষে খুন করেও খুনিরা ছাড়া পেয়ে গেছিল, এবং তার প্রতিবাদে নাগরিক সমাজের কিছু মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে সংবাদ-মাধ্যমের সহযোগিতায় ব্যাপক জনমত গড়ে তোলে। সেই জনমতের চাপে দিল্লী হাইকোর্ট নিজে থেকেই (*সুও মোটো*) সেই মুক্ত খুনীদের নতুন করে বিচার শুরু করে, এবং শেষ পর্যন্ত খুনিরা শাস্তি পায়। বাথানিটোলা হত্যাকাণ্ডে মৃতরা দলিত ও বিশেষ পশ্চাৎপদ বলেই কি মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজ নিশ্চুপ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে?

ভদ্রেশ্বর থানায় ধর্ষণ : একটি প্রতিবেদন

২৩ এপ্রিল, ২০১২ বেলা চারটে নাগাদ এক দরিদ্র রমণী ভদ্রেশ্বর থানার দারোগা কর্তৃক ধর্ষিত হলেন দারোগারই কোয়ার্টারে। মহিলার স্বামী গাড়ির ড্রাইভার, একটি ডাকাতির মামলায় তাকে আটক করা হয়েছিল। এই ধর্ষণের আগে ৪০ ঘন্টাও হয় নি, ২১ তারিখে তাকে জামিনে ছাড়া হয়েছে। ২২ তারিখে ওসি তাকে থানায় ডাকে, এবং তারা থানায় দেখা করতে এলে তাদের মোবাইল ফোন নম্বর নেয়। ২৩ তারিখে ওসি তার স্ত্রীকে ফোনে বলেন একা এসে থানায় দেখা করতে, 'তার স্বামীর কেস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে' কথা বলতে। দেড় মাইল দূরের বাড়ি থেকে মহিলা থানার উদ্দেশে রওনা দেন। রাস্তায় একটা পুলিশ ভ্যান তাকে তুলে নেয়। তাকে 'নিয়ে আসার' জন্য সেটি পাঠানো হয়েছিল। মহিলার লিখিত অভিযোগ অনুসারে, তিনি থানায় পৌঁছালে ওসি তাঁকে নিজের কোয়ার্টারের একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে দেন। সে সময় কোয়ার্টারে আর কেউ ছিল না। জোর করে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। ভয় দেখানো হয় যে রাজি না হলে তাঁর স্বামীর ভয়ানক বিপদ হবে। প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে তিনি ব্যর্থ হন। চিৎকার করার সাহস পান নি, ভয় পেয়েছিলেন যে চিৎকার করলে তাঁকে মেরে ফেলা হবে। ওসি-র কোয়ার্টারটি থানার কম্পাউন্ডের মধ্যে, ওসি-র অফিস থেকে তিন-চার মিটারের মধ্যে।

বাড়ি ফিরে তিনি স্বামীর কাছে সব খুলে বলেন। টেলিভিশনের প্রোগ্রামের নিচে যেসব টেলিফোন নম্বর দেওয়া থাকে সেগুলি দেখে স্বামী কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলে যোগাযোগ করেন আর তাদের সাহায্যে যোগাযোগ করেন এপিডিআর-কে।

এই তরুণ স্বামী-স্ত্রী ন্যায়বিচার চাইছিলেন, কিন্তু একা একা গিয়ে নালিশ রুজু করতে ভয় পাচ্ছিলেন। স্বামীটি বলেন, "আপনারা জানেন না পুলিশ কী করতে পারে। ডাকাতির কেসে অভিযুক্ত হয়ে আমি কিছুটা জানি।" যাই হোক, এপিডিআর যে তাঁদের পাশে থাকবে সে বিষয়ে আশ্বাস পেয়ে এবং এপিডিআর তাদের বারবার বলায় সন্ধ্যা ৮-৪৫ নাগাদ তাঁরা নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতাল চন্দননগর সাবডিভিশনাল হাসপাতালে যান। সেখানে তাঁরা ধর্ষণের অভিযোগ জানিয়ে ডাক্তারি পরীক্ষার অনুরোধ জানান। কিন্তু তাঁদের আশংকাই সত্য হলো। এমার্জেন্সিতে কর্তব্যরত মেডিক্যাল অফিসার তাঁদের কথা শুনে মহিলার ডাক্তারি পরীক্ষা করলেন না। মিনিট পনেরো পরে এপিডিআর-এর টিম হাসপাতালে পৌঁছায়। তারাও ডাক্তারবাবুকে বোঝানোর চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত এপিডিআর সরকারিভাবে অনুরোধ করার পর একটা আউটডোর টিকিট বানানো হয় এবং হাসপাতালের সুপারিন্ডেন্টের নির্দেশ পাওয়ার পর ডাক্তারি পরীক্ষার কাগজপত্র তৈরি হচ্ছিল। এসব যখন চলছিল তখন একজন লম্বাচওড়া লোক এমার্জেন্সিতে এসে নিজের মোবাইল ফোন থেকে ফোন করছিল। হাসপাতালের লোকজনের থেকে জানা গেল সে সাদা পোশাকে পুলিশের লোক।

এর মধ্যে এপিডিআর-ও পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, হাসপাতালের সুপারিন্ডেন্টের কোয়ার্টারে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছে। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনও হুগলির এসপি-র সঙ্গে কথা বলেছেন। এপিডিআর-এর টিম যখন হাসপাতালের সুপারিন্ডেন্টের সঙ্গে কথা বলছিল তখন তিনি একটা ফোন পান এবং জানান যে পুলিশের একটি টিম হাসপাতালে আসছে, তারা যদি সরকারিভাবে চায় তাহলে ধর্ষণের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় ডাক্তারি পরীক্ষা করা হবে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশের একটা বড়োসড়ো বাহিনী এসে উপস্থিত হয়, তার নেতৃত্বে প্রথমে ছিলেন চন্দননগরের এসডিপিও তথাগত বসু, পরে এএসপি অমিতাভ ভার্মা, আইপিএস। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে তারা ধর্ষিতা মহিলা ও তাঁর স্বামীকে জেরা করেন। আরও এক ঘন্টা পর চন্দননগর থানার ওসি মহিলাটির হাতে লেখা অভিযোগ গ্রহণ করেন। এই লিখিত অভিযোগে অভিযোগকারিণী পরিষ্কার জানিয়েছিলেন যে তিনি ভদ্রেশ্বর থানার দারোগা কর্তৃক দারোগার কোয়ার্টারে ধর্ষিতা হয়েছেন।

ধর্ষিতার কাছ থেকে নির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়ার পর চন্দননগর থানার ওসি ধর্ষণের অভিযোগের ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য সরকারি সুপারিশ করেন। রাত ১২টার সময় স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার টি কে ঘোষ পরীক্ষাটি করেন। অদ্ভুত কথা হলো, এমার্জেন্সির মেডিক্যাল অফিসার লেখেন যে ধর্ষণের অভিযোগটি ধর্ষিতার 'স্বামীর বক্তব্য অনুযায়ী', যদিও ধর্ষিতা মহিলাটি নিজেই তাঁর দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করেন এবং এপিডিআর-এর টিম-এর উপস্থিতিতেই পরিষ্কার বলেন যে তিনি ভদ্রেশ্বর থানার ওসি-র হাতে ধর্ষিতা হয়েছেন। পরে এমার্জেন্সির ডাক্তারবাবুকে এই গন্ডগোলটি দেখানো হলে তিনি ভুল স্বীকার করেন। রাত সাড়ে এগারোটার সময় হাসপাতালের সুপারিন্ডেন্টকেও এই গন্ডগোলটির কথা জানানো হয়।

হাসপাতাল ও পুলিশ প্রশাসন যে প্রথম দিকে ধর্ষণের এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে চায় নি, আর পরের দিকে যুদ্ধকালীন অবস্থার মতো গুরুত্ব দিয়ে সব কাজ হলো— দুইয়েরই পেছনে ছিল ধর্ষণের ঘটনাটিকে চেপে গিয়ে মহিলাকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা। এর পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে সেটা পরিষ্কার হয়ে যায়:

১। ২৪ এপ্রিল সকালে ধর্ষিতাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তার স্বামী ও ৫-৬ বছরের ছেলে সারারাত হাসপাতালে অভুক্ত অবস্থায় অপেক্ষারত ছিল। সবাই মিলে যখন হাসপাতাল থেকে বেরোতে যাবে, জোর করে তাদের একটি পুলিশের গাড়িতে তুলে নেওয়া হয়।

২। ওদের নিয়ে যাওয়া হয় ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে। হুগলির এসপি, আইপিএস তন্ময় রায়চৌধুরী ও অন্য সব অফিসাররা সেখানে ছিলেন। ধর্ষিতা ও তার স্বামীকে আর এক দফা জেরা করা চলে। ধর্ষিতার আরও একবার ডাক্তারি পরীক্ষাও করা হয়।

৩। ধর্ষিতা যদিও ভদ্রেশ্বর থানার ওসি-র বিরুদ্ধে নিয়মানুসারে অভিযোগ দায়ের করেন, সেই ওসি-র বিরুদ্ধে তখনও পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। বিকেলের দিকে অবশ্য সংবাদমাধ্যমের কাছে খবর পাওয়া যায় যে ওসি-কে 'ক্লোজড্' করা হয়েছে।

৪। ডাক্তারি পরীক্ষার পর বেলা দুটো নাগাদ পরিবারের তিনজনকে আবার একটা পুলিশের গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় চুঁচুড়া থানার মধ্যে অবস্থিত জেলা মহিলা থানায়। বেলা তিনটেয় তাদের আবার ইমামবাড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, আধ ঘন্টা পর আবার মহিলাকে থানায় নিয়ে আসা হয়।

৫। পাঁচটার সময় আমরা জানতে পারলাম পুরো পরিবারটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ভদ্রেশ্বর থানায়।

৬। সারা দিন ধরে বিশ্রাম নেই ঘুম নেই, পুলিশের বড় বড় অফিসারদের কাছে জেরা চলবার পর রাত ন'টা নাগাদ তারা থানা থেকে বেরোয়। কিন্তু তাদের বাড়িতে তাদের পাওয়া যায় নি, পরবর্তী ৩৬ ঘন্টায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগও করা যায় নি।

৭। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ২৫ তারিখে তাদের ভবানী ভবনে সিআইডি-র হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযুক্ত দারোগাকেও সেখানে যেতে বলা হয়েছিল। আর এক প্রস্থ জেরা চলে সেখানে।

৮। ২৫ তারিখ বিকেলের দিকে সংবাদমাধ্যম জানায় যে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত দারোগাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আরও ঘন্টা তিনেক পর সংবাদমাধ্যম জানায় যে অভিযোগকারিণী অভিযোগ 'তুলে নিয়েছে'।

এসবের থেকে এই রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছানো চলে যে,

১। স্বামী-স্ত্রীর বয়স বিশের কোঠায়, আর স্বামীটি ৪৫ দিন হাজতে থাকার পর ধর্ষণের ঘটনার আগে ৪০ ঘন্টাও হয়নি, বাড়ি ফিরেছিল। এ ক্ষেত্রে ধর্ষণের ফলে যোনিপথ ছিঁড়ে যাওয়ার কথা নয়। ধর্ষণের ডাক্তারি প্রমাণ পেতে হলে ধর্ষিতার যোনিপথ থেকে রস সংগ্রহ করে অভিযুক্তর সেমেনের সঙ্গে তা মেলাতে হবে। অভিযোগকারিণীর যোনিপথ থেকে এই রস সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত গন্ডগোলের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া ঘটনার সময় ধর্ষিতার জামাকাপড় নিয়ে সেগুলির ফরেনসিক পরীক্ষাও করা হয়নি— যা এরকম ক্ষেত্রে একেবারে অত্যাবশ্যক।

২। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যান্য ঘটনাগুলির মতো পুলিশ সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত মিথ্যা খবর দিয়ে গিয়েছে, যেমন

পশ্চিমবঙ্গই ভারতে দ্বিতীয়... ধর্ষণ-সংখ্যার বিচারে

জাতীয় মহিলা কমিশন-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে জানা গেল : আমাদের পশ্চিমবঙ্গই ধর্ষণ-সংখ্যার বিচারে সারা ভারতে দ্বিতীয়। শুধু তাই নয়, এই রাজ্যে ধর্ষণ-সংখ্যার গড় সর্বভারতীয় গড়ের দ্বিগুণ হয়ে গেছে। অন্য দিকে, আদালতে শাস্তিবিধানের ব্যাপারে এই রাজ্যের অবস্থান সারা ভারতে নিচের দিক থেকে দ্বিতীয়। অথচ এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন একজন সর্বশক্তিময়ী মহিলা! ব্যাপারটি কি একটু বিস্ময়ের নয়?

সম্প্রতি মহিলা কমিশনের তিন সদস্যের একটি দল এই রাজ্যে এসেছিল এখানে নারীদের কেমন নিরাপত্তা আছে তা পর্যালোচনার জন্য। তারাই রিপোর্টটি তৈরি করেছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের এ ধরনের অপরাধ ঠেকাবার জন্য প্রয়োজনীয় সক্রিয়তার অভাব রয়েছে। এর ফলে প্রায় বিনা বাধায় মহিলাদের উপর আক্রমণ বেড়েই চলেছে।

কলকাতা পুলিশ কমিশারিয়েট সম্প্রতি আদালতের নির্দেশ ছাড়া ধর্ষণের শিকার হওয়া সত্ত্বেও কোনো মহিলার মেডিক্যাল পরীক্ষা না করার যে রীতি চালু করেছে, সে-সম্পর্কেও কমিশন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং দ্রুত এই বিধির পরিবর্তন দাবি করেছে। কমিশন জানিয়েছে, দেশের অন্য সমস্ত রাজ্যে, এমনকি এই রাজ্যেরই বেশ কিছু অঞ্চলে বাতিল হয়ে যাওয়া এই রীতিটি সুপ্রিম কোর্ট ও বিভিন্ন হাইকোর্টের বিভিন্ন রায়ের ও নির্দেশের বিরোধী; কেননা এর ফলে ধর্ষণে অভিযুক্তরা সুবিধে পেয়ে যায় এবং বিলম্বের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্ট হয়ে যাবার আশংকা থাকে। সাম্প্রতিক পার্ক স্ট্রীট ধর্ষণকাণ্ডে ঠিক এই বিলম্বের অজুহাতেই পুলিশ প্রথম স্তরে অভিযোগটি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল বলে কমিশন মন্তব্য করেছে।

তাছাড়া ধর্ষণ মামলার তদন্তের দায়িত্বে থাকা যোগ্যতাসম্পন্ন আধিকারিকদের যেভাবে তদন্তের কাজ শেষ হবার আগেই সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে-ব্যাপারেও কমিশন বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। এ প্রসঙ্গে পার্ক স্ট্রীট ধর্ষণকাণ্ডের তদন্ত থেকে কলকাতা পুলিশের ডিসিপি দময়ন্তী সেনকে, এবং বাঁকুড়ায় এক প্রতিবন্ধী কিশোরীর ধর্ষণকাণ্ডের তদন্ত থেকে পুলিশ সুপার প্রণব কুমারকে সরিয়ে দেবার সরকারি সিদ্ধান্তেরও কমিশন সমালোচনা করেছে।

রিপোর্টে আরো জানানো হয়েছে, সাত বছরের বালিকা থেকে বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত সব বয়সের মহিলারাই সম্প্রতি এই রাজ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ গৃহবধূ, কেউ কর্মরতা। শুধু তাই নয়, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের ধর্ষণের সংখ্যা লজ্জাজনকভাবে বহু গুণ বেড়ে চলেছে, বাড়ছে আদিবাসী মহিলাদের ধর্ষণের সংখ্যাও। প্রকাশ্য দিবালোকে ধর্ষণ হচ্ছে, এমনকি সরকারি হাসপাতালেও মহিলারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। রিপোর্টে এই রাজ্যের যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে, তা রীতিমতো ভয়াবহ। গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৪৪ শতাংশ। ৩৯ শতাংশের বয়স ১৮-র নিচে। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা ১৭ শতাংশ। ৮ শতাংশ ঘটেছে ট্রেনে বা সরকারি হাসপাতালে। অভিযুক্তদের ৪৪ শতাংশই 'ফেরার', পুলিশ তাদের ধরতেই পারছে না। ২৫ শতাংশ ক্ষেত্রে পুলিশ এফআইআর করতে অস্বীকার করেছে, তবে অনেক ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশে বা জনমতের চাপে অভিযোগ নিতে বাধ্য হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা বেশি ঘটেছে জেলা, গ্রাম বা ছোটো শহরে। কমিশন সুপারিশ করেছে, রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরকে তাদের অধীন সমস্ত মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতাল-সহ চিকিৎসা সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা মহিলাদের উপর আক্রমণের ঘটনাগুলিতে অনেক বেশি সংবেদনশীল হন।

বাস্তব এটাই যে, ধর্ষণের সংখ্যার বিচারে এই রাজ্য পূর্ববর্তী জমানা থেকেই সারা দেশে সামনের সারিতে ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিককালে তার আরো 'অগ্রগতি' ঘটেছে। আর ট্র্যাজেডি এটাই যে, রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যখন বিরোধী নেত্রীর ভূমিকায় ছিলেন, তখন ধর্ষণ বা মহিলাদের উপর আক্রমণের ঘটনায় সবচেয়ে আগে তিনি ছুটে যেতেন এবং বিচার ও প্রতিবিধানের দাবিতে সোচ্চার হতেন। আর আজ মুখ্যমন্ত্রীর মসনদে বসার পর, তাঁর শাসিত রাজ্যে কোনো ধর্ষণের ঘটনা ঘটতে পারে বলেই তিনি সম্ভবত বিশ্বাস করেন না, তাই ধর্ষণের কোনো ঘটনা ঘটলেই তিনি মনে করেন, সেগুলি সব 'সাজানো' ঘটনা। সেকারণেই তিনি সম্ভবত এই রাজ্যে নারী নির্যাতনের বিষয়টিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না। এখন জাতীয় মহিলা কমিশনের এই রিপোর্টের পর তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হয়, আমরা তা দেখার অপেক্ষায় থাকব।

''ডাক্তারি পরীক্ষায় ধর্ষণের প্রমাণ মেলে নি'', ''মহিলাটির দুটি বিয়ে, চরিত্র খারাপ'', ''মহিলাটি স্বীকার করেছে যে তার মাথার গন্ডগোল আছে'' ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩। নিম্নোক্ত জরুরি বিষয়গুলির তদন্ত করা হয়েছিল কিনা জানা যায় নি:

ক) ভদ্রেশ্বর থানার দারোগা কেন একটি রেজিস্টার না করা সিম থেকে মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল— এরকম যোগাযোগ রাখাটা তার সরকারি কর্তব্যের মধ্যে পড়ে কিনা।

খ) ভদ্রেশ্বর থানার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে জানা যায়, যে অভিযোগে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে সে সময় অভিযোগকারিণী সত্যি থানায় ছিল কিনা।

গ) অভিযোগকারিণী দারোগার কোয়ার্টারের যে বর্ণনা দিয়েছে তার সঙ্গে আসলটা মেলে কিনা।

ঘ) ধর্ষণ হয়নি এটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অভিযোগকারিণীর যোনিপথের রসের সঙ্গে অভিযুক্তর সেমেন মেলানো এবং অভিযোগকারিণীর পোশাকের ফরেনসিক পরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

৪। পুলিশ অভিযোগকারিণীকে দুর্বল করার চেষ্টা চালায়, ২৩ এপ্রিল বিকাল চারটে থেকে ২৫ এপ্রিল বিকেল পর্যন্ত— প্রায় ৪৮ ঘন্টা ধরে তার ওপর ভয়ানক শারীরিক ও মানসিক চাপ দেওয়া চলে। এর ফলে যে আঘাত লাগে, তাতে সে অসুস্থ হয়ে পরে, মাথায় দারুন ব্যথা হয়, মানসিকভাবে এমন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে আগে পুলিশকে সে কী বলেছে তা আর মনে করতে পারে না। থাইরয়েডের অসুখ আছে তার, দুদিন ধরে সে ওষুধ ছাড়া ছিল, তাতেও তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটেছে। এর ফলে পুলিশ সুযোগ পেয়ে যায়, এবং একটি মুহূর্তও নষ্ট না করে সেই ভয়ানক মানসিক বিধ্বস্ত অবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তার বয়ান রাখতে নিয়ে যাওয়া হয়।

৫। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট থেকে মনে হয় যে অভিযোগকারিণী ১৬৪ ধারায় ধর্ষণের অভিযোগ তুলে নিয়ে বিবৃতি দেয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও যার পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু ১৬৪ ধারার ৬ নং উপধারায় বলা আছে কোনো স্বীকারোক্তি বা বিবৃতি রেকর্ড করার পর ম্যাজিস্ট্রেট কেসটিকে পাঠিয়ে দেবেন সেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, যাঁর আদালতে কেসটির তদন্ত বা শুনানি হবে।

তাই নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির জবাব চাই—

ক) পুলিশ বা সংবাদমাধ্যম কীভাবে ১৬৪ ধারায় অভিযোগকারিণীর দেওয়া বিবৃতি জানতে পারল, আইনে যেখানে সেই বিবৃতিটি যাওয়ার কথা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

খ) ১৬৪ ধারায় বিবৃতি দিলে তার ফল কী হতে পারে সে বিষয়ে কি অভিযোগকারিণীকে আইনি উপদেশ/ পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল?

গ) অভিযোগকারিণী অভিযোগ তুলে নিলেও, ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত কী ছাড়া পেতে পারে? ততদিন পর্যন্ত কী আইন অনুসারে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা নয়?

ঘ) অভিযোগকারিণীর অভিযোগের ভিত্তিতে যে তদন্ত চলছিল তা শেষ হওয়ার আগেই কেন অভিযোগকারিণীকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো বিবৃতি রেকর্ড করার জন্য? এর পেছনে পুলিশের একটা মতলব থাকা ছাড়া কী এর কোনো ব্যাখ্যা মেলে? অভিযোগকারিণী যাতে ন্যায়বিচার পায় সেজন্যই পুলিশ এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, নাকি তাদের সহকর্মীকে আইনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল?

৬। পুরো ঘটনাক্রম থেকে এটা মনে হয় না যে অভিযোগকারিণীর অভিযোগ মিথ্যা ছিল। বরং বোঝা যায় যে পুলিশ ধর্ষিতাকে কতদূর পর্যন্ত চাপ দিতে পারে যাতে সে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। ধর্ষিতার প্রতি এরকম ব্যবহার মানবাধিকারের সব সীমার বাইরে। অভিযোগকারিণীকে নতি স্বীকার করানোর জন্য এই চাপ দেওয়া চলেছে পুরো পরিবারটির উপরই, যাদের মধ্যে ছিল অভিযোগকারিণীর ৫-৬ বছরের শিশুও।

অভিযোগকারিণী যাতে ন্যায়বিচার পান তার জন্য মহিলা কমিশন ও মানবাধিকার কমিশন সহ সব মানবাধিকার সংগঠন ও আইনি ব্যবস্থার এগিয়ে আসা উচিত। জানা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন বিষয়টির সুয়ো মটো পর্যবেক্ষণ করছেন। মানবাধিকার সংগঠনগুলি, নারী সংগঠনগুলি ও সব গণতান্ত্রিক ব্যক্তি ও সংগঠনের উচিত এ বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানানো, ধর্ষিতাকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করার এই ভয়ানক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন করা।

রাজ্য পুলিশের দ্বারা প্রভাবান্বিত নয় এমন কোনো সংস্থা দিয়ে এই অভিযোগের তদন্ত করানো উচিত। ধর্ষণের শিকার কোনো মহিলা যখন মানসিকভাবে আঘাতগ্রস্ত সে অবস্থায় চাপ দিয়ে ১৬৪ ধারায় যে বিবৃতি নেওয়া হয়েছে সেটাকে বাতিল করা উচিত।

অভিযোগটি যেহেতু জামিন অযোগ্য অপরাধের, আইন অনুসারে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

(হুগলি জেলা এপিডিআর-এর ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম-এর প্রতিবেদন)

গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে একটি আবেদন

বামফ্রন্ট শাসনের অবসান ঘটিয়ে মাত্র এগারো মাস আগে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন হয়েছেন এক নতুন সরকার। পূর্বতন জমানার ক্রমবর্ধমান দলীয় স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতার বিরুদ্ধে ব্যাপক মানুষের গভীর বিক্ষোভ সঞ্চিত হয়েছিল, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের দেয়ালে-পিঠ-ঠেকে যাওয়া লড়াকু মানুষদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম সেই বিক্ষোভ ও সোচ্চার প্রতিবাদের গভীর রুদ্ধ স্রোতের আগল ভেঙে দিতে সফল হয়েছিল। সোচ্চার হয়ে উঠেছিল মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি, ধিক্কার জেগে উঠেছিল দলীয় ক্যাডার ও তাদের তাঁবেদার পুলিশ কর্তৃক মানুষের কণ্ঠরোধের ও অত্যাচার-নিপীড়ন-গণহত্যার বিরুদ্ধে। তার প্রভাবে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলাম আমরাও। নাগরিকসমাজের বৃহত্তর অংশটি— শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-ছাত্র-মানবাধিকার কর্মী ও অন্যান্য সমাজকর্মী— এক কথায়, সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ, পথে নেমেছিলাম মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে। প্রকৃতপক্ষে সেই সামাজিক ঐকতানের প্রতি ও গণতন্ত্র অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার মূল দাবির প্রতি প্রধান বিরোধী দলের সমর্থনই ছিল তাদের বিজয় অর্জনের পটভূমি— তাদের 'পরিবর্তন'-এর দাবির প্রতি মানুষের সমর্থনের ভিত্তি।

কিন্তু মাত্র এগারো মাসের মধ্যে নতুন সরকারের কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি বার বার লঙ্ঘিত হবার ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে, দিন দিন ধরা পড়ছে পূর্বতন জমানার পথে এদেরও সুস্পষ্ট পদসঞ্চারের ইঙ্গিত। নির্বাচন-পূর্ব প্রতিশ্রুতিগুলি মান্য করা হয়নি, শিক্ষায়তনগুলিতে সরকারি দলীয়বাহিনীর বাহুবল প্রদর্শনীর ও গণতান্ত্রিক সব রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে দলীয় একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অশ্লীল প্রতিযোগিতা চলছে, চলছে মানুষ কোন্ সংবাদপত্র পড়বে সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ ও সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে ঐতিহ্যবাহী লিটল ম্যাগাজিনগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন করার প্রচেষ্টা, নারীদের সম্মান রক্ষার দায়িত্বপালনে সচেতন অনীহা এবং পুলিশ ও প্রশাসনকে দলীয় ক্যাডার হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা। সামান্য কার্টুন প্রচার করার জন্য প্রোমোটারদের চক্রান্তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সম্মানিত অধ্যাপক আক্রান্ত ও গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই সব কার্যকলাপেরই ধারাবাহিকতায় ঘটেছে নোনাডাঙ্গার ঘটনা, বামফ্রন্ট সরকারের মতোই 'উন্নয়ন'-এর অজুহাতে কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে গরীব মানুষদের অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করার চক্রান্ত। আমরা তো ভুলে যাই নি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক বিপুল জনসর্থনের ভিত্তি ছিল সিঙ্গুরে গরীব মানুষদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তাঁর অনশন অথচ নোনাডাঙ্গার উচ্ছিন্ন মানুষেরা যখন প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন, তখন তাদের, এমনকি নন্দীগ্রামের ঘটনার মতো নারী-শিশুদের উপরও নেমে এসেছে পুলিশের এবং সাদা পোষাকে দলীয় মাস্তানদের লাঠি। তার প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ মিছিল-অবস্থানকারীদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ কার্যত সেগুলি নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। গত ৪০ বছর ধরে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে প্রতিটি সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় এপিডিআর-কর্মীরা মিছিল করতে গিয়ে সরকারি দলীয় বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন, উপস্থিত নিষ্ক্রিয় পুলিশ আবার তাদেরকেই গ্রেপ্তার করে সক্রিয়তা দেখিয়েছে। নোনাডাঙ্গার উচ্ছেদের প্রতিবাদে অনশনকারীদের শারীরিক অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটেছে, অথচ উচ্ছেদের বিরুদ্ধে অনশন করে ক্ষমতায় আরোহণের ভিত্তিস্থাপনকারী মুখ্যমন্ত্রী ভ্রূক্ষেপ করেন নি।

এই সব প্রবণতার বিরুদ্ধে আমরা, পূর্বতন সরকারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে পথে-নামা মানুষেরা, প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এবং একই দাবিতে আবার পথে নামাটা জরুরি হয়ে উঠছে বলে মনে করছি। এই প্রেক্ষিতেই আমরা দাবি করছি, গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে সরকার ও সরকারি দলের সব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আক্রমণ বন্ধ করা হোক, মুখ্যমন্ত্রী নিজে উদ্যোগ নিয়ে নোনাডাঙ্গার মানুষদের যাতে উচ্ছেদ না হতে হয়, তার জন্য ব্যবস্থা নিন; এবং এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করেছে, তাদের সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করুন এবং অবিলম্বে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করুন।

মহাশ্বেতা দেবী সুকুমারী ভট্টাচার্য অশোক সেন সুনন্দ সান্যাল তরুণ সান্যাল শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় রতন খাসনবিশ গৌতম ভদ্র শুভেন্দু দাশগুপ্ত মীরাতুন নাহার কবীর সুমন বোলান গঙ্গোপাধ্যায় অশোক মিত্র নবারুণ ভট্টাচার্য কৌশিক সেন প্রতুল মুখোপাধ্যায় সব্যসাচী দেব রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় সৃজন সেন সুমন মুখোপাধ্যায় জয়া মিত্র শতরূপা সান্যাল সুদেষ্ণা চক্রবর্তী অভিজিৎ করগুপ্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য মানস জোয়ারদার নব দত্ত অমিত ভট্টাচার্য কিরীটি রায় মেহের ইঞ্জিনিয়ার জিতেন নন্দী গৌতম সেন সুজাত ভদ্র কুমার রাণা সুমিত চৌধুরী কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় দীপংকর চক্রবর্তী অমিতদ্যুতি কুমার তাপস চক্রবর্তী প্রসাদ রায়চৌধুরী ধীরাজ সেনগুপ্ত মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার অশোক মুখোপাধ্যায় শুভাশিস মুখোপাধ্যায় প্রণব দে নারায়ণ সরকার মিলন মালাকার দিলীপ চক্রবর্তী তরুণ নস্কর অনুরাধা দেব সুদীপ্ত সেন বাপি সেনগুপ্ত রঞ্জিত সুর অনিমেষ সেনগুপ্ত সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘপরীদের গান

গীতি রূপান্তর ও সুর: রাজেশ দত্ত

ছোট্টো মেয়ে দেখছে আকাশ জানলা দিয়ে—
পুলিশ ভ্যানের জানলা দিয়ে মেঘের দেশে।
মেঘের দেশে মন চলে যায় ছোট্টো মেয়ের,
ছোট্টো মণি'র মেঘপরীরা নিরুদ্দেশ।।

নিরুদ্দেশের মেঘপরীরা আকাশে নেই, পথের ধুলোয়...
পথের ধুলোয় সবার মতোই কষ্টে আছে।
কষ্ট আছে এবং আছে পেটের খিদে,
পেটের খিদে আগুন জ্বালায় শিরায় শিরায়—
শিরায় আগুন, জ্বলছে জমি, বসত-ভিটে।।

ছোট্টো মেয়ের ছোট্টো বাসা পথের ধারে।
দেখছে মেয়ে জ্বলছে আগুন, পুড়ছে বাড়ি।
বাড়ি কোথায়? বাঁশ-পলিথিন-দড়াদড়ি—
ছোট্টো মেয়ে, তোরা তো সব দখলকারী!।

ওরা সবাই 'দখলকারী' — নোনাডাঙার ঝুপড়িবাসী।
কার তাতে কী? বাজছে নগর-উন্নয়নের ভাঙা কাঁসি।
কাদের জমি? কে নেয় দখল? প্রশ্ন কোরো না ছোট্টো মণি,
প্রশ্ন করলে তুমিও হবে দেবলীনা, কি দেবযানী।
তার চেয়ে বরং ছোট্টো মেয়ে,
বাঁচতে শেখো অন্ধ হয়ে।
মেঘ দেখো না, মেঘপরীদের—?
কক্ষনো না, কক্ষনো না...

৮ এপ্রিল গ্রেপ্তার হওয়া ন' বছরের মণিকা কুমারীর উদ্দেশ্যে সব্যসাচী গোস্বামীর কবিতা অবলম্বনে

রি-থিংকিং-এ যাঁরা নিবিষ্ট...

বিশ্বজিৎ সেন

এই অদ্ভুত সময়ের কবিতা কেমন হওয়া উচিত, ভাবছিলাম
আর অনাবাদী শস্যক্ষেত্রগুলি ধীর পায়ে আমাদের দিকে
এগিয়ে আসছিল
আর দাবানলের জিহ্বা ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছিল

আমরা সম্মিলিতভাবেই ভাবছিলাম
কারণ একজন ভাবলে নিষ্কর্ষ একপেশে হওয়ার
বিপদটা বেশি
তাই কায়দাকেতা ঠিক করে নিয়ে
কে আগে কে পরে নিজের ভাবনা বলবে এগুলো
লিখে পড়ে নিয়ে
আমরা সম্মিলিতভাবেই ভাবছিলাম

ভাবতে ভাবকে সহসা একজন বঙ্কিমী ভাষায়
নিজের বক্তব্য রাখতে আরম্ভ করলেন
কেলেঙ্কারি আর কাকে বলে
আমরা তাড়াতাড়ি তাঁকে নিরস্ত করলাম
কারণ এটা তো আর সেই সময় নয়
এটা এই সময়

তাঁকে থামাতে না থামাতেই আরেকজন হুতোমি ভাষায়
কল্‌কল্ করে উঠলেন
তাঁকেও ধরেপড়ে সামলানো গেল

ততোক্ষণে ভাবা ব্যাপারটা নিয়েই আমরা
সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়েছি
সময়টা দেখা যাচ্ছে সত্যিই অদ্ভুত
ভাবুক আর তাত্ত্বিকদের কথাগুলো নেহাৎ মিথ্যে নয়
আমাদের মাথার মধ্যে মানুষ নয়, তার হাতের তাবিজ
আর গলার মাদুলিগুলো ঝম্‌ঝম্ করছে
আমাদের মাথার মধ্যে সমাজ নয়, তার হাঁড়িপাতিল, শিলনোড়া
এগুলোই আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে

ওদিকে অনাবাদী শস্যক্ষেত্রগুলি ধীর পায়ে আমাদের দিকে
এগিয়ে আসছে
আর দাবানলের জিহ্বা ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে...

ঠাঁই

সব্যসাচী গোস্বামী

ঠাঁই বলতে বাঁশ, টিন আর পলিথিন বা দরমা বেড়া
ঠাঁই তুলতে বুলেট-ব্যাটন, ধমক-নিন্দা, পুলিশ জেরা
ঠাঁই বলতে মাথার আকাশ, আলগা জমি পায়ের তলায়
ঠাঁই তুলতে ফাটকা পুঁজি, কালো টাকা, ইউরো-ডলার
ঠাঁই বলতে ভাঙা বুকে বাঁচার স্পর্ধা বাস্তুহারার
ঠাঁই তুলতে গভীর রাতে পুলিশ ঢোকে নিঝুম পাড়ায়
ঠাঁই বলতে স্বপ্নগুলো নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়া
ঠাঁই তুলতে উন্নয়নের গল্পে বলা সবুরে মেওয়া

ঠাঁই খুঁজছি অভিজ্ঞান আর দেবলীনাদের চোখের ভাষায়
ঠাঁই খুঁজছি তোমার চোখেও স্পিনিং মিলের লড়াকু শ্রমিক
ঠাঁই খুঁজছি শাল, মহুয়া আর ধামসা, মাদল, বাঁশীর সুরে
ঠাঁই খুঁজছি ঘরের কোণে অসুখ বুকে অনেক দূরে
হার না মানা সেই কবিতায়, হৃদয়ে যার গুমরে ওঠে
যন্ত্রণা আর অনেক আগুন, চলকে ওঠা ভালবাসায়

ঠাঁই খুঁজছি এপথ ওপথ, অনেকটা পথ
হেঁটেই চলা ক্লান্তিবিহীন, আর শপথে
ঠাঁই খুঁজছি তোমার চোখেও, যুদ্ধ জয়ের সংহতিতে

ছড়া - ১

সৃজন সেন

১
ইঁদুর গর্ত খুঁড়ে মরে
সাপ এসে দখল করে।
লড়ে চাষী-ভুষোরা
মন্ত্রী হয়— নেতারা!

২
দিদি আমাদের কল্পতরু
বিলান তিনি দুই হাতে,
কাকে কিনবেন, কাকে বেচবেন
চিন্তা করেন রোজ রাতে।
গানের মেলায় মেলান তিনি
নোনাডাঙায় ঘর ভাঙেন,
অভাবিনী হয়ে তিনি
দিল্লী গিয়ে ভিখ মাগেন।

৩
ফুলশুদ্ধু ঘাস খেলেও গরু
গরু-ই ঠিক থাকে,
আর গরু হলেই থাকবে শিং
গুঁতোয় যাকে তাকে।

বাছুর কিন্তু গরুরই হয়,
বাছুর দিয়েই শুরু,
তারপর শিং গজায় যখন
তখন পুরো— গরু।
সেই গরুরাই ভিড় করেছে
আজকে নোনাডাঙ্গায়
শিং-এর তাকত্ দেখায় তারা
গরীব-বস্তি ভাঙায়।।

ছড়া - ২

১
অতএব চুপ করে থাকো,
প্রতিবাদ নাস্তি
নইলে কপালে আছে
যথোচিত শাস্তি।
কাকের কী আসে যায়
পেকে গেলে বেলটা,
জাহাজ না পেয়ে কেউ
পেয়ে গেলে রেলটা।

২
সাবধান সাবধান,
চোদ্দোশো উনিশে
শুভেচ্ছা জানালেও
ধরে নেবে পুলিশে।
উপরি জুটবে কিছু
পিঠে গালে দুমদাম
মুচলেকা দিতে হবে
তুমি নাকি ঘোর বাম।

৩
শিবঠাকুরের আপন দেশে
আইন যে চলে একুশে
সেকথা তো সবাই জানে,
কিন্তু দিদিমণির নতুন রাজে
সেই আইনে যোগ হলো যে
নতুন বিধি 'হাসি বারণ'—
সে কি সবাই মানে?
সেটাই নাকি রাজধর্ম
না মানলেই 'অপকর্ম'
ধরবে তখন পুলিশে।
রব ওঠে তাই দেশবিদেশে
'পরিবর্তন' হলো কীসে—
রাজ্য চালায় ফুলিশে?

— লেখক অজ্ঞাত (এসএমএস যোগে প্রাপ্ত)

প্রবন্ধ

প্রসঙ্গ : সি পি আই (এম)-এর সাম্প্রতিক মতাদর্শগত সিদ্ধান্ত

প্রবীণ রায়

❑ এক

আমরা যখন তরুণ যুবক, সেই ১৯৬০-এর দশকে, 'সংশোধনবাদ' কথাটি খুব প্রচলিত ছিল, তা নিয়ে প্রচুর চর্চা ও বিতর্ক হতো। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পরিভাষায় 'সংশোধন-বাদী' বলতে বোঝানো হতো কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেকার সেই সব ব্যক্তিকে, যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকাশ ঘটাচ্ছি বলে আসলে তাকে বিকৃত করতো, আন্দোলনকে বিকৃত ও বিপথে চালিত করার চক্রান্ত করতো। মার্কস-লেনিনের যুগে 'সংশোধনবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করা হতো বার্নস্টাইন, কাউট্স্কি প্রভৃতিকে; পরবর্তী যুগে ক্রুশ্চভ, তোগলিয়াত্তি, লিউ শাও চি, দেং শিয়াও পিং প্রভৃতিকে। মনে রাখা দরকার, ঠিক সে সময়েই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিভাজন ক্রমশ বাড়ছে এবং তার পরিণতিতে সিপিআই(এম)-এর জন্মের বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। সিপিআই(এম) দলটির সাম্প্রতিক ২০তম পার্টি-কংগ্রেসে নতুন করে তাদের মতাদর্শগত বক্তব্যের পরিমার্জনা করা হয়েছে। সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শুরুতেই 'সংশোধনবাদ' কথাটির উল্লেখ করা দরকার মনে হচ্ছে এ-কথাটি মনে করিয়ে দেবার জন্যই যে, পার্টিটির জন্মই হয়েছিল আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পতাকাকে সামনে রেখে।

❑ দুই

সিপিআই(এম)-এর জন্ম হয়েছিল ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) দু'টুকরো হবার মধ্যে দিয়ে। সিপিআই-এর এই দ্বিধা-বিভক্তি ছিল ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের দীর্ঘ দিনের প্রবণতার সঙ্গে বিশেষভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা, ১৯২০-র দশকে এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনার প্রায় প্রথম প্রহর থেকেই, ঐক্য নয়, বরং অনৈক্যই, গ্রুপগত কোন্দল-খেয়োখেয়ি-সমঝোতাই, ছিল পার্টির মধ্যেকার স্বাভাবিক প্রবণতা। এই প্রবণতাই বিশেষ জোরদার হয়ে উঠেছিল পঞ্চাশের দশকের প্রথম থেকে। এদেশে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা তেলেঙ্গানার লড়াইকে পেছন থেকে ছুরি মেরে স্তব্ধ করে দেবার প্রক্রিয়ায় এক মতাদর্শগত বিরোধ জন্ম নিয়েছিল। স্তালিনের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আলোচনাক্রমে রচিত কর্মসূচিগত দলিলের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে তা ধামাচাপা পড়লেও, কিছুদিনের মধ্যেই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল।

পরবর্তী এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস মূলত এই প্রশ্নে মতাদর্শগত ও উপদলীয় লড়াইয়ের ইতিহাস। তেলেঙ্গানার সময় থেকেই সশস্ত্র বিপ্লব, না সংসদীয় পথ— কোন্ পথে এগোবে লড়াই, তা নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। ১৯৫২-তে ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের পর থেকে সংসদীয় লাইনই প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। ১৯৫৩-তে স্তালিনের মৃত্যু ও ১৯৫৬-তে তে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে ক্রুশ্চভ কর্তৃক প্রকাশ্য নিঃস্তালিনীকরণ অভিযান শুরু হবার পর ক্রুশ্চভের এই বিপ্লব-বিরোধী আধুনিক সংশোধনবাদী লাইন অধিকাংশ দেশের মতো এদেশেও প্রাধান্যের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রুশ্চভ সংসদীয় পথে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের তত্ত্ব হাজির করেন। আপাদমস্তক মার্কসবাদ-বিরোধী এই তত্ত্বটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কার্যত গ্রহণ করে, এবং মূলত এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পার্টির মধ্যে মতবিরোধ আরও বেড়ে যায়। ষাটের দশকের সূচনাতেই চীন-সোভিয়েত মতাদর্শগত বিতর্কে চীনের পার্টি ক্রুশ্চভের অন্যান্য ভ্রান্ত তত্ত্ব ও বিচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিবিপ্লবী তত্ত্বকেও সরাসরি আক্রমণ করে। শুরু হয় চীন ও সোভিয়েত পার্টির মধ্যে আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত বিতর্ক। সেই বিতর্কের প্রভাবে ভারতেও বিভিন্ন প্রশ্নে মতাদর্শগত বিতর্ক তীব্রতর হয়ে ওঠে। ১৯৫৯-এ ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ এবং '৬২-তে ভারত-চীন যুদ্ধ সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করে।

বিপ্লবী কর্মীদের অধিকাংশই সেসময় চীনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন, এবং মতাদর্শগতভাবে ও বাস্তব ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে পার্টির মধ্যেকার বিভাজন প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হতে শুরু করে। তারই পরিণতিতে ১৯৬৪-তে সিপিআই দু'ভাগ হয়ে যায়, জন্ম নেয় সিপিআই(এম)। উল্লেখ্য যে, এই বিভাজন কিন্তু শুধু মতাদর্শগত প্রশ্নকে সামনে রেখে হয় নি, উপদলীয়তারও একটি ভূমিকা ছিল। এই নতুন পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মী মতাদর্শগতভাবে নিঃসন্দেহে সংসদের প্রতি অনুসরণীয় দৃষ্টিভঙ্গি -সহ বিভিন্ন প্রশ্নে চীনের অবস্থানের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু নতুন এই পার্টি-নেতৃত্বের অনেকেরই মতাদর্শগত অবস্থান ছিল মধ্যপন্থী বা প্রচ্ছন্নভাবে সোভিয়েত পার্টিরই পক্ষে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মীকে দলে টানার জন্য তাঁরা আপাত-চীনপন্থী একটি অবস্থান নিতে কসুর করেননি। ১৯২০-র দশকে পার্টির সামনের সারির নেতা ডাঙ্গের ব্রিটিশ সরকারের কাছে কার্যত মুচলেকা দিয়ে লেখা এবং সে-সময়ে ফাঁস-হয়ে-যাওয়া আত্মসমর্পণবাদী চিঠি-কে তাঁরা পার্টি-বিভাজনের একটি প্রধান অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রকাশিত তথ্যের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সেই ডাঙ্গেকেই

সভাপতি ও তাঁদের পক্ষের নাম্বুদ্রিপাদকে সাধারণ সম্পাদক করে পার্টির জাতীয় পরিষদকে পুনর্গঠিত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁরা, এবং সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার পরই কেবল তাঁরা নতুন পার্টি গড়ার পথে পা বাড়ান। শুধু তা-ই নয়, পার্টির পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে, এমনকি তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দের কাছে পর্যন্ত হাজির হয়ে বারবার ঘোষণা করা হয় যে, পার্টি হিংসার পথে যাবে না। কিন্তু ব্যাপক কর্মীদের সমর্থনের প্রত্যাশায় তাঁদের সেই সমস্ত অবস্থান ও কাণ্ডকারখানা তাঁরা অনেকটাই প্রচ্ছন্ন রেখে দিয়েছিলেন। অবশ্য নতুন পার্টি গড়ার সূচনা পর্বেও তার প্রমাণ মিলে যায়। অর্থাৎ মতাদর্শগত বিতর্কের পাশাপাশি চালু ছিল নানাবিধ গ্রুপগত কোন্দল ও সমাঝোতার প্রক্রিয়াও। এসবেরই পরিণতিতে জন্ম নিয়েছিল সিপিআই(এম)।

ব্যাপকসংখ্যক জঙ্গি কর্মীদের দাবি মেনে নিয়ে শুরুতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রশ্নে শান্তিপূর্ণ সংসদীয় পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সংশোধনীবাদী ক্রুশ্চভীয় লাইন স্পষ্টতই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। তাই অবিভক্ত পার্টির বিপ্লবী অংশের পক্ষ থেকে নতুন পার্টির জন্য যে খসড়া কর্মসূচী ১৯৬৪-র ২১শে এপ্রিল মে বাসবপুন্নায়ার ভূমিকা-সহ আলোচনার জন্য প্রচারিত হয়েছিল, তাতে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির আকাbWার উল্লেখ করা হলেও, শাসকশ্রেণী যে কখনও স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না— এই বক্তব্য অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছিল এবং ফলত সংসদীয় ও সংসদ-বহির্ভূত সংগ্রামের সমন্বয় ঘটিয়ে ক্ষমতা দখলের লাইন উপস্থাপিত হয়েছিল। এই খসড়া কর্মসূচিতে নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রের বা কোনো রাজ্যে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার, বা এভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সীমিতভাবে কাজে লাগিয়ে সমাজ-বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার কোনো বক্তব্য স্বভাবতই স্থান পায়নি। কিন্তু '৬৪-র নভেম্বরে কলকাতায় পার্টির সপ্তম কংগ্রেস যখন অনুষ্ঠিত হলো, তখন পার্টি-নেতৃত্বের বিভিন্ন উপদলগুলি মোটামুটি একটি আপস রফায়, এমনকি মৌলিক মতাদর্শগত ক্ষেত্রেও, পৌঁছে গেছে। ফলত এই পার্টি-কংগ্রেসে কর্মসূচীর ১১২নং ধারায় সংযোজিত হয়েছিল সম্পূর্ণ নতুন একটি বক্তব্য: "...পার্টি যদি এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যে, জনগণের আশু সমস্যাবলী প্রশমনের এক বিনম্র কর্মসূচীতে অঙ্গীকারবদ্ধ কোনো সরকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ রয়েছে, তাহলে সে নিশ্চয়ই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। এই ধরনের সরকার গঠনের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনে বিরাট প্রেরণা সঞ্চারিত হবে, গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনের প্রক্রিয়া সুসাধ্য হবে। অবশ্য এই ধরনের সরকার জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী মূলগতভাবে সমাধান করবে না। সুতরাং *জনগণের আশু সমস্যাবলী প্রশমন করতে পারে এবং এভাবে গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে* পারে এমন একটি অতিক্রান্তিকালীন সরকার গঠনের সমস্ত সুযোগকে কাজে লাগিয়েও কিন্তু পার্টি বর্তমান বৃহৎ বুর্জোয়া পরিচালিত বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্র ও সরকারের অপসারণের আবশ্যকতা সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে থাকবে" (*বাঁকা হরফ আমাদের*)। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে ডাঙ্গেপন্থী সিপিআই-অনুসৃত ক্রুশ্চভমার্কা সংশোধনবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে যে মার্কসবাদী নীতিনিষ্ঠায় অবিচল থাকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে সিপিআই(এম) যাত্রা শুরু করেছিল, কর্মসূচীর এই ১১২নং ধারাটিই ছিল তা থেকে বিচ্যুতির তথা সংসদীয় কানাগলির পথে যাত্রার প্রথম এবং তত্ত্বগতভাবে দেখতে গেলে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

কেননা একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে নির্বাচন ও পার্লামেন্টের প্রতি কমিউনিস্টদের অনুসরণীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব ও অনুশীলন থেকে এই শিক্ষাই মিলেছে যে, আজকের অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের যুগে পার্লামেন্টের প্রকৃত অর্থে কোনো প্রগতিশীল ভূমিকা নেই। লেনিন তাই বারবার এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন যে, জনগণের কোনো মৌলিক সমস্যার সমাধান বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও করা সম্ভব নয়— এমনকি মন্ত্রীরা 'সৎ' ও 'সমাজতান্ত্রিক' ভাবাপন্ন হলেও, বাস্তবত সেই সরকার অনিবার্যভাবেই বুর্জোয়া শোষণ-নিপীড়নকে আড়াল করার এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। সঙ্গে সঙ্গে লেনিন একথাও বলেছিলেন যে, বাস্তব পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া ব্যবস্থার অসারতা সাধারণ মানুষের সামনে উদঘাটিত করে দেবার জন্য সংগ্রামের অন্যতম রূপ হিসাবে পার্লামেন্ট নির্বাচনে কমিউনিস্টরা বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থে প্রয়োজনবোধে অংশ নিতেই পারে, কিন্তু 'পার্লামেন্টের ভেতরের কাজকে পুরোপুরিভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে পার্লামেন্ট বহির্ভূত গণআন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্তব্যের অধীন হতে হবে।' আর এঙ্গেলস, লেনিন ও ডিমিট্রভ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেছেন, রাজনৈতিক সংকটকালীন পরিস্থিতিতে, বিপ্লব যখন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, তখন বাস্তব অবস্থার বিচারে কমিউনিস্টরা সরকারে অংশ নিতে পারে বটে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও তাদের মুখ্য কাজ হবে উৎপাদন ও আর্থিক ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, পুলিশ-সশস্ত্র বাহিনী প্রভৃতি রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতিয়ারগুলিকে ভেঙে বা অকেজো করে দেওয়া এবং পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণীকে সশস্ত্র ও সংগঠিত করে তোলা। সবচেয়ে বড়ো কথা, বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যে নির্বাচন বা সরকারে কমিউনিস্টরা অংশ নিলেও, সেগুলি সম্পর্কে মোহ বাড়ানো নয়, বরং মোহ ভাঙা তথা বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটিত করাটাই হবে তাদের মূল লক্ষ্য।

কিন্তু সিপিআই(এম) কর্মসূচীর পূর্বোক্ত ১১২নং ধারায়

পার্টির সংসদীয় কার্যকলাপকে সংসদ বহির্ভূত গণআন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্তব্যের অধীন করার আবশ্যিকতা সম্পর্কিত একটি বাক্যও নেই। উল্লেখ্য যে, এমনকি ১৯৬৪-র প্রথম (ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য, 'সপ্তম' হিসেবে অভিহিত) কংগ্রেসে কর্মসূচী সংক্রান্ত আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গেরই সুশীতল রায়চৌধুরী সুনির্দিষ্টভাবে সেই মর্মে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করলেও নেতৃত্ব তা প্রত্যাখ্যান করে। বাস্তবেও বরং এই মার্কসবাদী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রবণতা, অর্থাৎ গণ-আন্দোলন-সহ পার্টির সমস্ত কার্যকলাপকে সংসদীয় কার্যকলাপের অধীন করে ফেলার লাইনই গত সাড়ে তিন দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত হয়ে চলেছে। এই প্রক্রিয়ার অনুশীলন শুরু হয়েছিল পার্টি-কর্মসূচী গৃহীত হবার দুবছরের মধ্যেই। ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবাংলায় যখন খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক এক গণ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, তখন রাতারাতি শাসকশ্রেণীর নির্বাচনী টোপটি বিনা দ্বিধায় গিলে নিয়ে পার্টি-নেতৃত্ব সেই গণআন্দোলনের গতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল এবং সমস্ত শক্তিকে নির্বাচনী গন্ডির মধ্যে সীমিত করে দিয়েছিল। অবশ্য এরই পরিণতিকে ১৯৬৭-তে যখন শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল, তখন সিপিআই(এম) নেতৃবৃন্দ সেই সরকারকে 'গণআন্দোলনের ঢাল' হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন, এবং সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে শ্রমজীবী মানুষ বিরাট বিরাট আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু মালিকশ্রেণী ও তার ভাড়াটে সংবাদপত্রগুলি এর ফলে 'গেলো গেলো' রব তুলতেই এবং কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারে পতন ঘটাবার জন্য তোড়জোড় শুরু করতেই নেতৃবৃন্দ সরকারকে বাঁচাবার তাগিদে সমস্ত গণআন্দোলনের টুঁটি চেপে স্তব্ধ করে দেন। নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের ওপর রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণ নামিয়ে আনে ওই সরকার। সমস্ত জঙ্গি আন্দোলন কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। বস্তুত '৬৭ ও '৬৯-এর দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে গণআন্দোলনকে ক্রমশ স্তিমিত থেকে স্তিমিততর করে তোলা হয়েছে এবং সংসদীয় কার্যকলাপ গণআন্দোলন-সহ সংসদ-বহির্ভূত কার্যকলাপের ওপর ক্রমশ সার্বিক প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। আর সিপিআই(এম) নেতৃবৃন্দও এই দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারে অংশ-গ্রহণের মধ্যে দিয়ে এই নির্মম 'মার্কসবাদী' সিদ্ধান্তটি হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হন যে, বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যে একটি রাজ্যে ক্ষমতায় এসে আর যা-ই করা যাক, 'গণআন্দোলনের হাতিয়ার' হিসেবে কাজ করা যায় না।

তারপর প্রায় সাঁইত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ভূমিষ্ঠ এই পার্টিটির প্রাথমিক অবস্থান থেকে দূরত্ব যে ক্রমশ বেড়েছে, তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই মিলেছে, ১৯৬৪-র কর্মসূচী ও '৬৮-তে গৃহীত মতাদর্শগত দলিলের, এবং আজ পর্যন্ত অনুসৃত বিভিন্ন কার্যকলাপ ও অবস্থানের মধ্যে দিয়ে। তার ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরবর্তী 'পরিবর্তিত পরিস্থিতি'-র প্রেক্ষিতে ১৯৯২-তে পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে অক্টোবর,২০০০-এ অনুষ্ঠিত পার্টির বিশেষ সম্মেলনে '৬৪-র পার্টি কর্মসূচীকে 'সময়োপযোগী' করে পরিমার্জিত করা হয়েছিল। তারপর এবার পার্টি-কংগ্রেসে আবার তার পরিমার্জনা ঘটানো হলো। সিপিএম কোন্ পথে ও কোন্ দিকে যাচ্ছে— তা নিয়ে বিতর্ক ছিল তার জন্মলগ্ন থেকেই। পার্টি-কর্মসূচীর সাম্প্রতিক এই পরিমার্জনা সেই বিতর্ককেই আরও উস্কে দিয়েছে এবং তীব্রতর করে তুলেছে। এই নিবন্ধে সেই মৌলিক প্রশ্নটিরই মোকাবিলা করার চেষ্টা আমরা করবো।

❑ তিন

সিপিআই(এম)-এর সূচনাপর্বে আন্তর্জাতিক প্রশ্নে চীনের পার্টির অবস্থানের প্রতি আপাত সমর্থনের ভঙ্গি থাকলেও গ্রুপগত সমঝোতার স্বার্থে জন্মমুহূর্তে কোনো আন্তর্জাতিক লাইনই কিন্তু গৃহীত হয়নি। অবশেষে ১৯৬৮-তে সেই আন্তর্জাতিক লাইন প্রণীত হবার পর দেখা গিয়েছিল, চীনের পার্টির অবস্থানের সঙ্গে বহু বিষয়েই তাদের মতাদর্শগত পার্থক্য রয়েছে। তবুও কিন্তু পার্টিটির মূল ঝোঁক ছিল সোভিয়েত পার্টির অবস্থানের বিরুদ্ধে, বিশেষত প্রতিটি প্রশ্নে সোভিয়েত পার্টির সঙ্গে পুরোপুরি অভিন্ন অবস্থানে থাকা ডাঙ্গেপন্থীদের বিরুদ্ধে। তাই সিপিআই(এম)-এর জন্মের প্রথম প্রহরে গৃহীত মতাদর্শগত প্রস্তাবে সগর্বে ঘোষণা করা হয়েছিল : ''এমন একটিও মৌলিক প্রশ্ন নেই; যে বিষয়ে আমাদের ও ডাঙ্গেপন্থীদের অবস্থান পুরোপুরি বিপরীত নয়।''

সেই মতাদর্শগত বিরোধ জন্ম নিয়েছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনের গ্রহণীয় লাইন তথা স্তালিনোত্তর সোভিয়েত পার্টি ও রাষ্ট্রের এবং তাদের অনুসৃত লাইনের মূল্যায়ন, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পন্থা, ভারতীয় রাষ্ট্র তথা সে সময় ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের মূল্যায়ন, ভারতের বাস্তব পটভূমিকায় শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণী-সমঝোতা, বিপ্লবের রণনীতিগত ও রণকৌশগত লাইন প্রভৃতি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। আধুনিক সংশোধনবাদী লাইনের ভারতীয় প্রতিনিধি সিপিআই-নেতৃত্ব তখন আন্তর্জাতিক প্রশ্নে সোভিয়েত পার্টিকে ও তার অনুসৃত নীতি ও লাইনগুলিকে পুরোপুরি সঠিক বলে ঘোষণা করেছিলেন, সংসদীয় পন্থার শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের লাইনকে সমর্থন করেছিলেন। এসবের বিরুদ্ধে সূচনাপর্বে সিপিআই(এম)-এর অবস্থান ছিল নেতৃত্বের নিজের ভাষায় ''পুরোপুরি বিপরীত''।

আন্তর্জাতিক প্রশ্ন নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাক। আগেই বলেছি, জন্মের প্রথম প্রহরে সিপিআই(এম) আধুনিক সংশোধনবাদকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের 'প্রধান বিপদ' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল এবং তার 'মূল উৎস' হিসেবে

সরাসরি দায়ী করেছিল সোভিয়েত পার্টিকে। সেই সোভিয়েত পার্টির নেতৃত্ব সম্পর্কে সিপিআই(এম) অভিযোগ তুলেছিল : ''আধুনিক সংশোধনবাদ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আনদোলনের ঐক্য বিনষ্ট করছে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর গুরুত্ব বিঘ্নিত করছে।'' সাম্রাজ্যবাদ থাকলে যুদ্ধও অবশ্যম্ভাবী— এই লেনিনবাদী তত্বকে তুলে ধরে সিপিআই(এম) এ থেকে বিচ্যুতির জন্য সোভিয়েত পার্টিকে সমালোচনা করে বলেছিল : ''তারা যুদ্ধবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ে ভাঙন ধরাচ্ছে।'' পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ ও নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে সোভিয়েত পার্টিকে ''এক শ্রেণী-সম্পর্কহীন দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ধারণা'' ফেরি করার জন্য অভিযুক্ত করে বলেছিল : তারা ''সাধারণ সংগ্রামে ভাঙন ধরাচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরে বিভেদ সৃষ্টি করছে এবং সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মোহ ছড়াচ্ছে।'' শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কে সোভিয়েত পার্টির বক্তব্য সম্পর্কে সিপিআই(এম) বলেছিল : তারা ''সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণীকে নিরস্ত্র করে দিচ্ছে'' এবং ''সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে ভাঙন ধরাচ্ছে।'' সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্পর্কে সোভিয়েত পার্টির ফেরি করা সংসদীয় শান্তিপূর্ণ পথের দাওয়াই সম্পর্কে সিপিআই(এম) বলেছিল : ''তারা সমাজ-বদল ও বিপ্লব প্রভৃতি বিষয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারণাকেই পাল্টে দিতে চাইছে।'' সামগ্রিকভাবে সোভিয়েত পার্টি কর্তৃক অনুসৃত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, শান্তিপূর্ণ উত্তরণ ও শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার লাইন সম্পর্কে মূল্যায়ন করে বলা হয়েছিল : ''সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শান্তি, গণতন্ত্র স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য দুনিয়াজোড়া বিপ্লবী সংগ্রাম এর ফলে বিঘ্নিত ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ছে'' এবং এই বলে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছিল যে ক্রুশ্চভ তথা ''সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অনুসৃত আধুনিক সংশোধনবাদ দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সবচেয়ে ক্ষতি করছে।''

অর্থাৎ এক কথায়, সে-সময় সিপিআই(এম) সোভিয়েত পার্টিকে চিহ্নিত করেছিল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো বিপদ আধুনিক সংশোধনবাদের প্রধান প্রবক্তা এবং মার্কসবাদ-বিরোধী হিসেবে— যারা শ্রেণী-সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম, দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছিল এবং দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আক্রমণ চালিয়ে এক নতুন ধরনের পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করছিল।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রশ্নে সিপিআই(এম)-এর এই সব সোভিয়েত বিরোধী অবস্থান গৃহীত হয়েছিল ১৯৬৭-৬৮তে। ১৯৬৮-তে প্রকাশিত পার্টির পলিটব্যুরোর 'মতাদর্শগত বিতর্কের সার-সংকলন'-এ এগুলি ব্যাখ্যাও করা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র একবছরের মধ্যেই এ-সব প্রশ্নে পার্টির অবস্থান পুরোপুরি ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছিল। তর্কশাস্ত্র তথা অংকশাস্ত্রের নিয়মে, সোভিয়েতের অবস্থানের 'পুরোপুরি বিপরীত' অবস্থানে থাকা সিপিআই(এম)-এর অবস্থানের এই পুরোপুরি বিপরীতমুখী যাত্রা বাস্তবে সিপিআই(এম)-এর মস্কো-যাত্রারই সূচনা করেছিল।

এই প্রক্রিয়ার প্রথম পর্বে ১৯৬৮-র অষ্টম পার্টি-কংগ্রেস থেকেই আধুনিক সংশোধনবাদকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের 'প্রধান বিপদ' এবং সোভিয়েত পার্টিকে তার 'প্রধান উৎস' হিসেবে চিহ্নিত করার প্রাথমিক অবস্থানটি নিঃশব্দে বর্জন করা হয়েছে। সপ্তম কংগ্রেসে সোভিয়েত পার্টির আধুনিক সংশোধনবাদী লাইনকে 'প্রধান বিপদ' বলে ঘোষণা করার সঙ্গে গৌণ বিপদ হিসেবে চীনের পার্টি 'বাম সংকীর্ণতাবাদী' লাইনেরও সমালোচনা করা হয়েছিল। অষ্টম ও নবম কংগ্রেসে আধুনিক সংশোধনবাদ ও বাম সংকীর্ণতাবাদকে সমান আসনে বসিয়ে সমালোচনা করার মধ্যে দিয়ে আক্রমণের বর্শামুখ কার্যত সোভিয়েত পার্টির দিক থেকে সরিয়ে আনা শুরু হয়েছিল। দশম কংগ্রেসে তুলনামূলকভাবে চীনের পার্টিকে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত করার প্রবণতা খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবে ধরা পড়লেও, পার্টি কংগ্রেসে সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দের ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। একাদশ কংগ্রেস থেকে আধুনিক সংশোধনবাদের বা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক একটি বাক্য পর্যন্ত স্থান পায় নি। অর্থাৎ, আধুনিক সংশোধনবাদ বা সোভিয়েত পার্টি আর কোনো বিপদ নয় বলে সিপিআই(এম) নেতৃত্ব কার্যত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু কবে এবং কীভাবে এ বিপদ দূরীভূত হলো, সে সম্পর্কে সামান্যতম ব্যাখ্যা তখন পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। শুধু তাই নয়, দ্বাদশ কংগ্রেস থেকে সিপিআই(এম) সোভিয়েত ইউনিয়নকে এমনকি বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের তথা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের তথা শান্তি আন্দোলনের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ১৯৬৮-তেও সোভিয়েত নতুন ধরনের পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার যে আশংকার কথা পার্টি-নেতৃত্ব উচ্চারণ করেছিলেন, তারও সামান্যতম উল্লেখ, বা কীভাবে সে আশংকা দূর হলো তারও কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেতৃত্ব অনুভবই করেননি। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তথা সোভিয়েত পার্টি ও রাষ্ট্রের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সিপিআই(এম) নেতৃত্ব সুস্পষ্টভাবে ফিরে গিয়েছিল প্রাক-১৯৬৪ পর্বের সিপিআই-এর অবস্থানে।

সিপিআই(এম) নেতৃত্ব সে সময় উগ্র সোভিয়েতপন্থী অবস্থান গ্রহণ করতে গিয়ে নিজেরাই কিন্তু নানাধরনের পরস্পর-বিরোধী অবস্থানের এবং গোঁজামিল দেওয়া বক্তব্যের নজির রেখেছিলেন। যেমন, ব্রেজনেভ পরবর্তী জমানায় গর্বাচভ যখন সোভিয়েতের বিরাট এক অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত হবার তথ্য হাজির করছেন, তখনও সিপিআই(এম) নেতৃত্ব তাদের

পার্টি কংগ্রেসগুলিতে সোভিয়েতের ধারাবাহিক 'অগ্রগতির' কাহিনী রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার গর্বাচভ যখন ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের পুরোনো মদ নতুন বোতলে পরিবেশন করেছেন, তখন নেতৃত্ব তার সমালোচনা করেও ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেসে (১৯৮৮-৮৯) যথারীতি সোভিয়েতের 'অগ্রগতি' ও 'ইতিবাচক' ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে সোভিয়েতকে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক শিবির, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দুনিয়াজোড়া সংগ্রাম ও বিশ্ব-শান্তি-আন্দোলনের নেতা হিসেবে বিনা দ্বিধায় তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের পথ থেকে মূলত বিচ্যুত সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কেও ১৯৬৮-পরবর্তী কালপর্বে তাদের অমোচনীয় মোহে ভাটা পড়েনি।

কিন্তু ১৯৮৯-তে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের শূন্যগর্ভ কাঠামোটিও যখন তাসের ঘরের মতো বিধ্বস্ত হয়ে গেল, তখন আর গত্যন্তর থাকলো না, পার্টি নেতৃত্বকে ১৯৯২-এর চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হলো যে,"ত্রয়োদশ কংগ্রেসের আগেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এবং অনেক কমিউনিস্ট পার্টিতে গুরুতর পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। কিন্তু তখন আমরা সেগুলির গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারিনি।" এবং এই অপ্রতিরোধ্য স্বীকৃতির ধারাবাহিকতাতেই ২০০০ সালে পরিমার্জিত পার্টি কর্মসূচীতে বলা হয়েছিল : "কিন্তু সমাজতন্ত্র নির্মাণের অনির্ধারিত পথের যাত্রায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি গুরুত্র ভুলও করে। এই ভুলের উৎস সমাজতন্ত্র নির্মাণের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব, পার্টি ও রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা, অর্থনীতি ও তা পরিচালনার ক্ষেত্রে সময়মতো যথাযথ পরিবর্তন আনার ব্যর্থতা; পার্টি, রাষ্ট্র ও সমাজে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, আমলাতান্ত্রিকতার বৃদ্ধি এবং মতাদর্শগত চেতনার অবক্ষয়"। ২০১২-র পার্টি-কংগ্রেসে গৃহীত মতাদর্শগত সিদ্ধান্তে সেই অবস্থানের ধারাবাহিকতায় আরো যোগ করা হয়েছে : "সমাজতন্ত্রকে দেখা হয়েছিল একটি এক মুখী অগ্রগতি হিসেবে। এই ভুল চিন্তা জন্ম নিয়েছিল যে, একবার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তা শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে, ঠিক যেমন মার্ক্স বলেছিলেন : "সমাজতন্ত্র হচ্ছে শ্রেণীবিভক্ত শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজ ও শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজের মধ্যবর্তী— সাম্যবাদের প্রথম পর্যায়। সেকারণে এই উৎক্রমণশীল পর্যায়ে, সংজ্ঞা অনুসারেই, শ্রেণীসংঘর্ষের অবসান ঘটে না, বরং তার তীব্রতাই বৃদ্ধি পায়— বিশ্ব-পুঁজিবাদ তার হারানো সাম্রাজ্য পুনর্দখল করার প্রচেষ্টা চালায়। সেকারণেই এই পর্যায়টি হবে নানা বাঁক ও মোড়যুক্ত, দীর্ঘায়ত ও জটিল। এই প্রক্রিয়া বিশেষভাবে প্রযুক্ত হবে পশ্চাৎপদ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হলে"।

অথচ মূলত এ-কথাগুলিই দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছিলেন মাওসেতুঙের নেতৃত্বাধীন চীনের পার্টি এবং ভারত-সহ বিভিন্ন দেশের মাও-অনুসারী কমিউনিস্টরা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে। তখন তাঁদেরকে 'বাম সংকীর্ণতাবাদী' আখ্যা দিয়ে 'প্রধান বিপদ' আধুনিক সংশোধনবাদের সঙ্গে সমান আসনে বসিয়ে তাদেরকে নস্যাৎ করার 'বিপ্লবী' দায়িত্ব পালনে সিপিএম-নেতৃত্ব কখনও পরাঙ্মুখ হয়নি। শুধু তাই নয়। ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের উত্থান ও সোভিয়েতে ক্ষমতা দখলের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে মাওসেতুং সেই ষাটের দশকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও শ্রেণী-সংগ্রাম চালিয়ে যাবার আবশ্যিকতার কথা ব্যাখ্যা করে ঘোষণা করেছিলেন : সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের প্রক্রিয়া হবে খুবই জটিল, আঁকাবাঁকা ও দীর্ঘায়ত। সেজন্য চীনের মাও-উত্তর জমানার সংশোধনবাদীদের সানাইয়ের প্রতিধ্বনি তুলে তাঁকে 'মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত' বলে অভিহিত করতেও দ্বিধা বোধ করেননি যে সিপিআই(এম) নেতৃবৃন্দ, তাঁরাই আবার তাঁদের ২০০০ সালে, এবং এবারও পরিমার্জিত পার্টি কর্মসূচীতে, প্রায় মাওয়ের কথাই ধার করে ঘোষণা করেছেন : 'ইতিহাস প্রমাণ করেছে, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ এক ধাক্কায় ঘটে না, এটি হবে শ্রেণীসংগ্রামের এক দীর্ঘস্থায়ী পর্ব— এমনকি রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরেও।" বোঝাই যাচ্ছে, বাস্তব ঘটনার ধাক্কায় প্রায় রাতারাতিই বদলে গেছে তাদের মতটা। প্রকৃত আত্ম-সমালোচনা ছাড়াই খৃষ্টীয় ধর্মসম্মত অনুশাসন অনুসারী এই 'ভুল স্বীকারের' (confession) প্রক্রিয়া যে মার্কসবাদী নৈতিকতার পুরোপুরি বিরোধী, সেকথা স্বভাবতই তাঁরা স্বীকার করবেন না!

❑ চার

এবার জাতীয় ক্ষেত্রে সিপিআই(এম)-এর অবস্থান তথা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত আলোচনায় আসা যাক। ১৯৬৪-র কর্মসূচীতে সিপিআই(এম) ভারতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রচরিত্রের ব্যাখ্যা করে ভারত সরকারের চরিত্র নির্ধারণ করেছিল সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর নিয়ন্ত্রিত একটি বুর্জোয়া-জমিদার সরকার হিসেবে, যার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দুই নীতি-ই ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এই বৃহৎ বুর্জোয়ার সম্পর্ককে অভিহিত করা হয়েছিল "দ্বন্দ্ব ও আঁতাতের সম্পর্ক" হিসেবে, এবং সাম্রাজ্যবাদের ওপর তাদের নির্ভরতা সত্ত্বেও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তাদের 'স্বাধীন' চরিত্রের ওপরেই। আর বিপ্লবের স্তর নির্ধারিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর হিসেবে। কৃষি বিপ্লবকে সেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের 'প্রধান অক্ষ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল।

আগেই বলেছি, পার্টি-নেতৃত্ব এই নির্মম 'মার্কসবাদী' সিদ্ধান্তটি হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হন যে, ১৯৬৭-৬৯-এই

উপলব্ধি করেন যে, বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যে একটি রাজ্যে ক্ষমতায় এসে আর যা-ই করা যাক, 'গণআন্দোলনের হাতিয়ার' হিসেবে কাজ করা যায় না। সেই কারণেই কুখ্যাত এমার্জেন্সির পর গণসমর্থন নিয়ে তারা যখন ১৯৭৭-এ তাদের সরকার গঠনের 'বিপ্লবী' লাইনকে একধাপ উঁচুতে উন্নীত করে 'যুক্তফ্রন্ট' সরকারের বদলে 'বাম' ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন প্রথম থেকেই তারা গণআন্দোলনের ব্যাপারটাকে 'স্থিতাবস্থা' বিঘ্নিত হবার— অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকারকে বিপন্ন করার— অজুহাতে ছেঁটে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। এই পর্যায়ে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে গণআন্দোলনের মাধ্যমে গণচেতনা বাড়াবার জন্য লব্ধ শিক্ষাকে পুরোপুরি বরবাদ করে দিয়ে তাঁরা এক নতুন লাইন হাজির করেন, যার মমার্থ হলো : এদেশের বর্তমান কাঠামোর তাদের মতো বামপন্থীরা সরকার গঠন করে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে না পারলেও, ''এমন কিছু সংস্কারমূলক কাজের উদ্যোগ নিতে ও সেগুলিকে রূপায়িত করতে পারে, যার ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মানের কিছুটা উন্নতি সম্ভব।'' এই 'রিলিফ' দেবার রাজনীতিই, তাঁদের মতে, সরকারের তথা বর্তমান সমাজকাঠামোর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলবে এবং এ থেকে জনগণ ''মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত প্রত্যয়ে পৌঁছোবেন, এবং তখনই বাঞ্ছিত পরিবর্তনের জন্য শ্রেণীশক্তিকে সংহত করে তোলা সম্ভব হবে উঠবে।'' বামফন্ট সরকারের আমলেও গণআন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তারা স্বীকার করেছেন, ''তবে এইসব আন্দোলন ও সংগ্রামের ফলে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের হাত যেন শক্ত হয়''— সে সম্পর্কেও হুঁশিয়ার করে দেন। তাঁদের মতে, ''বামফ্রন্ট সরকারকে চোখের মণি মতো রক্ষা করা শ্রমজীবী জনসাধারণের সমস্ত অংশের সামনে একটি জরুরি কর্তব্য'', দেখতে হবে এসব আন্দোলনের ফলে যেন ''সরকারের হাত শক্ত হয় এবং জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বাড়ে।'' তাই, ''এমন কোনো দাবি তাদের উপস্থিত করা উচিত নয়, যা পূরণ করা খুব কঠিন অথবা যা পূরণ করতে সরকারি সহায় সম্পদের উপর খুবই চাপ সৃষ্টি করা হবে।'' এভাবেই একদিকে তারা বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যে রাজ্যসরকারের সীমাবদ্ধতাই জনগণকে মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে বলে তত্ত্ব হাজির করেছেন, এবং অন্যদিকে সেই সীমাবদ্ধতার দোহাই দিয়েই তারা কড়া হাতে সমস্ত গণ-আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিয়ে জনগণকে সচেতন করার পূর্ব-ঘোষিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। ফলত শেষ পর্যন্ত সিপিএম তথা বামফ্রন্টের অবস্থান দাঁড়াচ্ছে এটাই যে, গণআন্দোলনের মধ্যে গণচেতনা গড়ে তোলার লাইনটিও বহুদিন পরিত্যক্ত, বাকি থাকলো শুধু কিছু ''সংস্কার সাধন'' এবং ''জনগণের সমস্যার কিছু প্রশমন'' করার— জনগণকে কিছুটা 'রিলিফ' দেবার লাইনটি।

কিছু রিলিফ দিয়ে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন করা বা সমস্যার কিছু প্রশমনের ব্যবস্থা করা যাবে— এ চিন্তা একটি সমাজগণতন্ত্রী চিন্তা, এর সঙ্গে মার্কসবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মার্কসবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার যুগে লেনিন অক্লান্তভাবে এই সমাজগণতন্ত্রী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কারকে পুঁজিবাদী কাঠামোটাকে ঘষে মেজে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য কাজে লাগাতে চায়। আর সর্বহারা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংস্কারকে গণ্য করা হয় শ্রেণী-সংগ্রামের উপজাত ফসল হিসেবে। শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীনতা, শ্রেণীচেতনা ও লড়াই করার দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করার মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী সংগ্রাম বিকাশের পক্ষে সর্বহারা দৃষ্টিভঙ্গি-ভিত্তিক সেই সংস্কার ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারগুলির মাধ্যমে সিপিআই(এম) যে সংস্কার সাধন করার কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে, সেগুলি বাস্তবত মোটেই শ্রেণী সংগ্রামের উপজাত ফসল নয়, বরং সরকারে টিকে থাকার লক্ষ্যে কাঠামোটাকে ঘষামাজা করার বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি-ভিত্তিক সংস্কার। ফলত তা শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীনতা শ্রেণী-চেতনা ও লড়াইয়ের দক্ষতা বিকাশের বদলে তাদেরকে শ্রেণীগতভাবে হতোদ্যম করার কারণ হিসেবেই কাজ করছে।

অবশ্য সিপিআই(এম) কর্মসূচী অনুসারে পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারগুলি জনগণকে একেবারেই সচেতন করছে না বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রতিনিয়ত সেগুলি জনগণকে ক্রমাগত সচেতন করে চলেছে— যাতে কেন্দ্রেও জনগণ তাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে। এবং শেষ পর্যন্ত ঝোলা থেকে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ইতিহাস-প্রত্যাখ্যাত এই ক্রুশ্চভীয় লাইনটিই পুরোপুরি বেরিয়ে পড়ে, যখন প্রকাশ্য সভায় জ্যোতি বসু বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করেন, ''আমরা পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার গঠন করেছি, কিন্তু কেন্দ্রে সরকার গঠন না করা পর্যন্ত কোনো মৌলিক সমস্যার সমাধান অসম্ভব। কেন্দ্রে ক্ষমতা পেলে আমরা দেশে মৌলিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হতাম''; যখন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিবাবু প্রকাশ্যে বিনা দ্বিধায় স্বীকার করেন যে, পার্লামেন্টারি পথ পরিত্যাগ করার কোনো পরিকল্পনাই সিপিআই(এম)-এর নেই, বরং ''এই পথে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসতে পারে কিনা, তা দেখবার জন্য আমরা একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছি।''

সংসদীয় পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের একদা-ধিক্কৃত এই ডাঙ্গেপন্থী সংশোধনবাদী লাইনটি সম্পর্কে '৬৪-র পার্টি কর্মসূচীতে তবু খানিকটা ঘোমটা ছিল। কিন্তু ২০০০-র

'সময়োপযোগী পরিমার্জনা'র ফলে সেই আবরণও খসে গিয়ে নগ্নভাবে উদঘাটিত হয়ে যায় বিপ্লবিয়ানার আড়ালে সযত্নে লুকিয়ে রাখা সংশোধনবাদী মর্মবস্তুটি। '৬৪-র কর্মসূচীর ১১২নং ধারায় সরকারে অংশগ্রহণের যে লাইন ছিল, এতদিন পর্যন্ত সেই সরকার বলতে আদৌ কেন্দ্রীয় সরকারকে বোঝানো হতো না, বোঝানো হতো শুধুমাত্র রাজ্য সরকারগুলিকেই। ১৯৮৫ সালে দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসের আগে সংসদীয় কানাগলির পথে পার্টির ধারাবাহিক পদক্ষেপগুলি নিয়ে পার্টির মধ্যে প্রশ্ন ওঠে। তখন পার্টির সামনের সারির তাত্ত্বিক এম বাসবপুন্নায়া কেন্দ্রীয় কমিটির তাত্ত্বিক মুখপত্রে (*দি মার্ক্সিস্ট*) এক প্রবন্ধ লেখেন। পার্টি পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারগুলি পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরায় পার্টি-নির্দেশিত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে জনগণকে পরিচালনা করার জন্য প্রকৃতই 'সংগ্রামের হাতিয়ার' হিসেবে ভূমিকা পালন করছে, না ভারতের বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্রের একটি প্রত্যঙ্গে পরিণত হয়েছে, তা নিয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন তখনও পর্যন্ত পার্টি নেতৃত্ব করে উঠতে পারেন নি বলে তিনি সেখানে তার করুণ স্বীকারোক্তি করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেন, যে ১১২নং ধারা অনুসারে এই বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যে রাজ্যস্তরে সরকার গঠন করলেও কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ক্ষেত্রে এই ধারা কখনোই প্রযুক্ত হবে না, কেননা, তাঁর নিজের ভাষায়, তাহলে ''শান্তিপূর্ণ সংসদীয় পথেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে উন্নীত হবার দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী মতাদর্শের জোয়ার আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।'' অথচ সিপিআই(এম)-এর 'সময়োপযোগী পরিমার্জিত কর্মসূচীর ৭.১৭নং প্যারায় ('৬৪-র মূল কর্মসূচীর ১১২নং ধারা) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ''পার্টি সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী *রাজ্যগুলিতে অথবা কেন্দ্রে*'' সরকার গঠনের সুযোগ পেলে তা গ্রহণ করবে। অর্থাৎ, বাসবপুন্নায়ার ওপরে উদ্ধৃত বক্তব্য অনুসারেই, ''দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী মতাদর্শের জোয়ার'' সিপিআই(এম)-কে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে!

শুধু তাই নয়। ওই ধারাতে আরেকটি বাক্যাংশও সংযোজিত হয়েছে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে : এধরনের সরকারে গিয়ে পার্টি ''বর্তমান সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিকল্প নীতিগুলি তুলে ধরা ও প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে।'' তাহলে বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যেই সরকারে গিয়ে বিকল্প নীতিগুলি প্রয়োগ করার চেষ্টা করা যায়! ক্রুশ্চভ বা ডাঙ্গেরা এই বক্তব্য থেকে মূলত আলাদা কিছু কি বলেছিলেন? আসল ষাটের দশকে ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার প্রকৃত বিপ্লবী জঙ্গী কর্মীরা যা-ই ভাবুন না কেন, সিপিআই(এম) নেতৃত্ব আদৌ ভারতে সমাজ-বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন কিনা, তা নিয়েই এখন প্রশ্ন তোলা যায়। আগেই বলেছি, ডাঙ্গেপন্থীদের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইনের বিপরীতে তাঁরা তুলে ধরেছিলেন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন এবং ঘোষণা করেছিলেন, কৃষি বিপ্লবই হবে ঐ বিপ্লবের মূল অক্ষ। কিন্তু কীভাবে কৃষিবিপ্লবকে মূল অক্ষ হিসেবে নিয়ে এই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করা যাবে সে-সম্পর্কে '৬৪-র কর্মসূচীতে শুধু বলা হয়েছিল : সংসদীয় ও সংসদ বহির্ভূত সংগ্রামের সমন্বয় গড়ে তোলা যাবে। সে সম্পর্কে কি '৬৪-র কর্মসূচীতে, কি সাম্প্রতিক 'পরিমার্জিত' কর্মসূচীতে কোনো ব্যাখ্যাই দেওয়া হয় নি। সংসদে অংশ নিলেও সংসদীয় কার্যকলাপকে যে অবশ্যই সংসদ-বহির্ভূত গণসংগ্রামের অধীন হতে হবে— কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এই লেনিনীয় শিক্ষাকে কোথাও উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি। তাহলে কীভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায় যে নেতৃবৃন্দ সত্যিই সিপিআই (এম)-কে বিপ্লবী পার্টি হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন?

❑ পাঁচ

২০১২-র সদ্যগৃহীত মতাদর্শগত সিদ্ধান্তে নতুন করে আর একবার তাত্ত্বিকভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে এতোদিন অনুসৃত সেই সুস্পষ্ট সংসদ-সর্বস্ব সংশোধনবাদী লাইন থেকে 'দূরত্ব' তৈরি করার। বলা হয়েছে : ''বর্তমান পরিস্থিতিতে সংসদীয় ও সংসদ-বহির্ভূত কাজের একটি যথোপযুক্ত সমন্বয় গড়ে তোলাটাই পার্টির সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব'' (প্যারা ১০.৩)... ''গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ ও প্রসারণের লড়াই হচ্ছে বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ও জনগণতন্ত্রের অধীনে উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণেরই অঙ্গ'' (প্যারা ১০.৫)... ''এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই সংসদীয় মঞ্চের কাজকে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার করতে হবে। সংসদীয় সংগ্রামকে সমন্বিত করতে হবে সংসদ-বহির্ভূত কাজ এবং বিরাজমান বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রের বিকল্প জমানা গড়ে তোলার সংগ্রামের সঙ্গে'' (প্যারা ১০.৬)... ''সম্ভাব্য জোরালো বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আমাদের সতর্কতা বজায় রাখতে হবে... ''সংসদীয় গণতন্ত্র জনগণের মধ্যে, বিশেষত রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধের মাধ্যমে এমন সব মোহের জন্ম দিতে পারে, যা শ্রেণী ও গণসংগ্রামকে স্তব্ধ বা দুর্বল করে দিতে পারে'' (প্যারা ১০.৭)... ''তাছাড়াও সংসদীয় পথে উত্তরণের মোহও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে... সংসদীয় সংগ্রামের সাথে সংসদ-বহির্ভূত কাজের কার্যকর সমন্বয়ের জন্য সংসদীয়বাদ ও সংসদীয় মোহের বিরুদ্ধে সতর্কতা বজায় রাখা দরকার'' (প্যারা ১০.৮)। একই সাথে আবার 'মাওবাদী' 'বাম' বিচ্যুতির প্রসঙ্গ তুলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে : ''এই ধরনের বাম হঠকারী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াইকে জোরদার করে তোলা এবং রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে তাদের প্রতিহত করা দরকার'' (প্যারা ১০.৯)।

স্বীকার করতেই হবে যে, উপরোক্ত বক্তব্যগুলির মধ্যে দিয়ে 'সংসদীয় পথে উত্তরণের মোহ'-এর বিরুদ্ধে প্রতিফলিত বক্তব্য

এতো স্পষ্টভাবে এর আগে বলা হয় নি। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতাবৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ আজ আর শুধু মুখের কথায় চিড়ে ভেজানোর সম্ভাব্যতা স্বীকার করে না, বরং কথায় ও কাজে মিল খোঁজে, বাস্তব অনুশীলনের সাথে কথাকে মিলিয়ে নিতে চায়। বিশেষত এবারের মতাদর্শগত সিদ্ধান্ত যখন গৃহীত হয়েছে, ঠিক তার আগেই বিগত কয়েক বছর ধরে সংসদীয় ক্ষেত্রে সিপিআই(এম)-নেতৃত্বাধীন সংসদীয় বামপন্থী শিবির এক বিরাট ধাক্কা খেয়েছে; কেরালা তো বটেই, ৩৪ বছর ধরে তাদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণাধীন পশ্চিমবঙ্গে পর্যন্ত তাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। স্বভাবতই এই ধারাবাহিক পশ্চাদপসরণের প্রেক্ষিতে মতাদর্শগত সিদ্ধান্ত পরিমার্জিত হলে মানুষ তার মধ্যে তার ব্যাখ্যা প্রত্যাশা করবে, এবং নতুন করে মতাদর্শের 'স্পষ্টতা' সূত্রায়িত করার প্রচেষ্টার সাথে বাস্তবকে তুলনা করবেই। প্রথমত, সিপিআই(এম)-নেতৃত্ব তাদের সদ্যসমাপ্ত পার্টি-কংগ্রেসেও এই পশ্চাদপসরণের কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তুলে ধরতে পারেন নি। শুধু মুখে 'কনফেশন' করা হয়েছে: 'আমাদের ভুল হয়েছিল', 'মানুষকে আমরা বোঝাতে পারি নি'। কোনো সামগ্রিক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আদৌ তুলে ধরারই চেষ্টা এমনকি পার্টি-কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাব বা মতাদর্শগত দলিলে ধরা পড়ে নি। অথচ অন্য পরে কা কথা, অশোক মিত্রের মতো আদ্যোপান্ত বামপন্থী চেতনার সিপিআই(এম)-ঘনিষ্ঠ মানুষ পর্যন্ত এই পরাজয়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন পার্টির মতাদর্শগত বিচ্যুতিকে; প্রভাত পট্টনায়েক দায়ী করেছেন মৌলিক শ্রেণীগুলি থেকে পার্টির বিচ্ছিন্নতাকে। ফলত, পার্টি-কংগ্রেসে গৃহীত উপরে-উদ্ধৃত বক্তব্যগুলির সাথে রাজনৈতিক বাস্তবতার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় নি, বরং পার্টির বাস্তব কার্যকলাপ থেকে সহজেই মিলে গেছে ধারাবাহিক দ্বিচারিতার এক লজ্জাজনক অধ্যায়, যার পরিণতিতে এই পার্টির মধ্যে এখনও বিপ্লবাকাঙ্খী মানুষের উপস্থিতি থাকলেও সার্বিকভাবে পার্টিটিকে আর আদৌ 'বিপ্লবী' বা প্রকৃত 'বামপন্থী' চরিত্রের বলে অভিহিত করা যায় কিনা, তাই নিয়েই প্রশ্ন তোলা যায়।

আমরা আগে দেখেছি, সিপিআই(এম) ক্ষমতাসীন হলেই তাদের সরকারকে 'গণআন্দোলনের ঢাল' হিসেবে ব্যবহারের তত্ত্ব থেকে সরকারকে 'চোখের মণির মতো রক্ষা করার' তত্ত্বে উপনীত হয়। ফলে সরকার অসুবিধেয় পড়তে পারে এমন সব আন্দোলন করাই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এসব কথা আমরা আগেই বলেছি। অন্য দিকে যে সব রাজ্যে পার্টি ক্ষমতাসীন হয় নি, সেসব ক্ষেত্রে গণআন্দোলনের উপর মূলত কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় না— যেমন, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা প্রভৃতি। ফলে, বাস্তবত তাদের তাত্ত্বিক অবস্থানটি দাঁড়ায় এরকম : ক্ষমতাসীন হবার মতো প্রয়োজনীয় জনসমর্থন অর্জন করার জন্য সরকার-বিরোধী আন্দোলনকে তীব্র করে তোলো, কিন্তু ক্ষমতাসীন হলেই সব আন্দোলন বন্ধ করে দাও। অর্থাৎ, সব আন্দোলনের মূল লক্ষ্য দাঁড়ায় একটাই : ভোটের মাধ্যমে সরকারে আসীন হবার জন্য জনসমর্থন অর্জন করার লক্ষ্যে গণআন্দোলনকে ব্যবহার করো! তাহলে, তাদের মতাদর্শগত সিদ্ধান্তে বর্ণিত "সংসদ-বহির্ভূত কাজ এবং বিরাজমান বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রের বিকল্প জমানা গড়ে তোলার সংগ্রামের" স্বার্থে সংসদীয় কাজকে ব্যবহার করার কোনো দৃষ্টান্ত তো বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে মিলছে না; বরং যার বিরুদ্ধে নেতৃত্ব অন্তত তাত্ত্বিকভাবে তোপ দেগেছেন, সেই "সংসদীয় পথে উত্তরণের মোহ"-ই তো শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তাহলে বিপ্লবী ভাবভঙ্গি করে ওসব বুলি আউড়ে লাভটা কী!

আর নেতৃত্ব যদি সৎভাবে ও বিপ্লবী মানসিকতার ভিত্তিতে তাদের পশ্চাদপসরণের কারণ সত্যিই খুঁজতেন, তাহলে ধরা পড়তো, এর পিছনে মূল কারণ হিসেবে কাজ করেছে প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদ তথা শোষকশ্রেণীর নির্দেশিত অর্থনৈতিক পন্থার কাছে তাদের পরিচালিত সরকারগুলির, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে, নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ; দ্বিতীয়ত, পার্টির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার নাম করে মৌলিক গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ চালানো, এবং কার্যত পার্টিতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিণতিতে ব্যাপক মেহনতি মানুষেরও তাদের বিরুদ্ধে চলে যাওয়া। সেগুলি কিন্তু নেতৃত্ব আজ পর্যন্ত স্বীকার করেন নি, বরং পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ নেতারা আজও বলে চলেছেন : তাঁদের অনুসৃত নীতিতে কোনো ভুল ছিল না। নেতৃত্ব তাদের দলিলে সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বায়ন, পুঁজির আগ্রাসী অভিযানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার জন্য অনেক ভালো ভালো তাত্ত্বিক বক্তব্য রেখেছেন, তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথাও বার বার বলেছেন, কিন্তু তাদের পরিচালিত সরকারগুলিই ঘোষিত নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির পথ অনুসরণ করেছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে কৃষক-স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে গিয়ে লেনিনের 'নেপ'-এর বিকৃত ব্যাখ্যা হাজির করতেও তাদের বাধে নি। আধুনিক যুগে অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের প্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্র গড়তে গিয়ে প্রাথমিক স্তরে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটাবার প্রয়োজনীয়তা লেনিন থেকে মাও কেউই অস্বীকার করেননি। তবে তাঁরা সেটা করার কর্মসূচি নিয়েছেন *বিপ্লবের পরে এবং সাময়িকভাবে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে একটি প্রয়োজনীয় ধাপ হিসেবে, শ্রমিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণের অধীনে— মেহনতি মানুষের শ্রেণীস্বার্থের পক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়ে।* কিন্তু সিপিআই(এম)-নেতৃত্ব তাদেরই ভাষায় বুর্জোয়া-জমিদার-নিয়ন্ত্রিত ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যেও সেই নীতি অনুসরণ করে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার পক্ষে নির্লজ্জভাবে ওকালতি করেছেন। পার্টি প্রকাশ্যে ১৮৯৪-এর জমি অধিগ্রহণ আইন

বাতিল করার দাবি তুলেছে; সিঙ্গুরে এই আইন ব্যবহার করেই তাদের সরকার কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়েছে। পার্টি বিশ্বায়নের অঙ্গ *সেজ*-এর বিরুদ্ধে অবস্থান ঘোষণা করেছে; নন্দীগ্রামে *সেজ*-এর বিরোধিতা করার 'অপরাধে' তাদেরই একদা-কৃষক-কর্মীদের গণহত্যার শিকার হয়েছে। পার্টি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিরোধিতা করেছে; এই রাজ্যে হরিপুরে শেষ দিন পর্যন্ত তাদের সরকার পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। পার্টি ব্যাপক মেহনতি মানুষের কাছে গণতন্ত্রের স্বাদ পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে; বাস্তবে 'বাম' মোড়কে এক নতুন ধরণের স্বৈরতন্ত্র পার্টিতন্ত্রের মাকড়শার জাল ছড়িয়ে দিয়ে পার্টি, পুলিশ ও প্রশাসনের এক বেনজির সমীকরণের মাধ্যমে, মূলত গ্রামে-গঞ্জে এবং অনেক পরিমাণে শহরাঞ্চলেও, গড়ে তোলা হয়েছে। সেই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দূরের কথা, সামান্য প্রতিবাদ জানাবার 'অপরাধেই' বহু মানুষকে প্রচণ্ড অপদস্থ, আক্রান্ত ও বিপন্ন হতে হয়েছে। ফলে নিশ্ছিদ্র নিস্তব্ধতা ও প্রতিবাদহীনতার এক দুঃসহ পরিবেশ সমাজে কায়েম হয়ে গেছে। জাতীয় স্তরে নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদ-নিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার তারস্বরে বিরোধিতা করেছেন, অথচ তাদের শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে গণআন্দোলনকে গলা টিপে হত্যা করে সেই সাম্রাজ্যবাদী উন্নয়নের পথই তাঁরা অনুসরণ করেছেন, এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও কার্যত সেই লাইন মেনে নিয়েছেন। এক কথায় 'সমাজ-বিপ্লব'-এর ধারণাটিই তাঁদের 'অ্যাজেন্ডা' থেকে, কার্যকর অভিধান থেকে বিসর্জিত হয়েছে। বিপ্লবের কথা এখন তাঁরা রুটিনমাফিক উচ্চারণ করেন তিন-চার বছর অন্তর একবারই— তাঁদের পার্টি কংগ্রেসের সময়ে।

জাতীয় প্রেক্ষিতে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের আলোচনায় যতি টানবো। জাতীয় স্তরে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য তথা পুঁজির আগ্রাসী অভিযান প্রতিহত করার লক্ষ্যে নেতৃত্ব এমন এক ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন, যা ''গণতন্ত্র, জাতীয় সার্বভৌমত্ব, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি এবং জনগণের জীবিকা ও অধিকার রক্ষার'' ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবে। বস্তুত এই কর্মসূচি প্রায় প্রথম থেকেই নেতৃত্ব ঘোষণা করে আসছেন। এবং অন্য দিকে তাঁরা তীব্র বিরোধিতা করেছেন সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাতভিত্তিক রাজনীতি, আঞ্চলিকতাবাদ, উত্তর-আধুনিকতা-বাদী চিন্তাধারা প্রভৃতির বিরুদ্ধে। বাস্তবে কিন্তু আমরা দেখেছি, বিভিন্ন সময়ে বারংবার তাঁরা এক তথাকথিত 'তৃতীয় ফ্রন্ট' গড়ে তোলার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন বিএসপি, সোস্যালিস্ট দল, ডিএমকে, এআইডিএমকে, টিডিপি প্রভৃতি দলের সঙ্গে— যাদের অস্তিত্বই নির্ভর করছে জাত-পাতভিত্তিক রাজনীতি, আঞ্চলিকতাবাদ প্রভৃতি তাঁদেরই মতে ক্ষতিকর প্রবণতার উপর। এই পরস্পর-বিরোধিতাকে তাঁরা কীভাবে ব্যাখ্যা করছেন, পার্টির সামনের সারির নেতা সীতারাম ইয়েচুরিকে পার্টি-কংগ্রেসের পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি জবাব দিয়েছিলেন— দু'টি আলাদা, একটি বিপ্লবের লক্ষ্যে, অন্যটি নির্বাচনের জন্য। অর্থাৎ তাঁরা মতাদর্শগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বাম ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়ার লক্ষ্যে; আর বাস্তবে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালাচ্ছেন ভোটের জোট তৈরির। তাহলে, আসলে তাঁরা কি বিপ্লবী ঐক্য বা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোর্চার বদলে সংসদীয় মোর্চা গড়ে তোলাটাকেই অনেক বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন না? তাহলে কীভাবে ওই পার্টিটিকে 'বিপ্লবী' আখ্যা দেওয়া যায়!

অন্য দিকে, প্রকৃত মতাদর্শগত বিতর্কের ও ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে যাদের সঙ্গে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়ে তুলতে পারতেন, সেই নকশালপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে 'বড়দা'-সুলভ নানা শর্ত দিয়ে (সম্ভবত সেই সব গোষ্ঠীর কর্মীদের বিপ্লবের আকাbখার কাছাকাছি ঘেঁষতে দিলে বিপদ হবার আশংকায়!) নেতৃত্ব দূরে সরিয়ে রেখেছেন। আর 'মাওবাদী' 'বাম হঠকারী' বিচ্যুতির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াইকে জোরদার করে তোলার এবং রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে তাদের প্রতিহত করার'' স্লোগান তুললেও, প্রকৃত অর্থে সেই রাজনৈতিক সংগ্রাম কখনোই তাঁরা চালান নি, বরং জোর দিয়েছেন রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে তাদের দমন করার উপর। এ ব্যাপারে চিদাম্বরমের সাথে মূলত কোনো পার্থক্যের পরিচয়ই তাঁরা রাখতে পারেন নি। উপরন্তু জ্যোতি বসুর জমানায় প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় কোনো কালা কানুন অনুসরণ না করার যে নীতি অনুসৃত হয়েছে (মাত্র দু'টি ব্যতিক্রম বাদে), তা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নির্লজ্জভাবে সেই সব কালা কানুন পুলিশের মর্জিমতো ব্যবহার করা হয়েছে। ফলত, দেশের ব্যাপক সাধারণ মানুষ, যাঁরা হয়তো রাজনীতির বা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব একেবারেই পড়েন নি, কেন তাঁরাও নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রথম বা দ্বিতীয় তথা বর্তমান পর্যায়ে 'মাওবাদীদের' ব্যক্তিহত্যার লাইনের সমালোচনা সত্ত্বেও, তাঁদেরকে নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে সিপিআই(এম)-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তি থেকেই আলাদা করে গভীর এক শ্রদ্ধার চোখে দেখেন; কেন অতীতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে আত্মসুখ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা-বিমুখ মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ আত্মত্যাগের মানসিকতা অকুতোভয় আদর্শনিষ্ঠ কর্মীদের দেখা যেতো, তাঁদের উত্তরাধিকার, হাজার ত্রুটি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও, বিগত সত্তর দশকের বা বর্তমানের বিপ্লবপন্থী কর্মীরাই তা বয়ে নিয়ে চলেছেন বলে মনে করেন— সে প্রশ্নের উত্তর সিপিআই(এম)-নেতৃত্বের পক্ষে দেওয়া সম্ভবই হয় না। উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন কেন আজ তাদের পার্টির এক বিরাট অংশই, বিশেষত ১৯৮০-পরবর্তীকালে পার্টিতে যুক্ত অধিকাংশ কর্মীই, স্বার্থান্বেষী ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী; তাদের স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা, ভুয়া জঙ্গিপনা, ডাহা সুবিধেবাদ, আত্মপ্রতিষ্ঠাবাদ ও প্রতিটি ক্ষেত্রে গুছিয়ে নেবার প্রবণতা আজ

সমাজতন্ত্র, কমিউনিজ্ম তথা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তথা বামপন্থা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে ব্যাপক জনগণের ঘৃণার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ক্ষমতা দখলের সুযোগ করে দিচ্ছে।

❑ **ছয়**

আলোচনা আর দীর্ঘায়ত করে লাভ নেই। এবারকার মতাদর্শগত সিদ্ধান্তে নতুন সংযোজিত আর দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করে এই আলোচনা আমরা শেষ করবো।

এক) প্রথমে আমরা দেখবো চীন প্রসঙ্গে সিপিআই(এম)-নেতৃত্বের বর্তমান অবস্থানটি। আমরা আগেই দেখেছি, মাও-পরবর্তী চীনের অধঃপতিত পার্টি-নেতৃত্বের প্রাসঙ্গিক অবস্থানের অনুসরণ করে সিপিআই(এম)-নেতৃত্ব অতীতে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীসমাজের তীব্রতা বৃদ্ধি সম্পর্কে মাও-এর বক্তব্যের বিরোধিতা করলেও, তাদের নতুন মতাদর্শগত দলিলে তাঁরা মাও-এর সেই সমাজতন্ত্রেও বিপ্লবী লড়াইয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার তত্ত্ব মূলত মেনে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, দলিলে স্বীকার করা হয়েছে যে (প্যারা ৬.৩- ৬.২৩), এমনকি চীন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি যে সব 'সমাজতান্ত্রিক' দেশে অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচি কার্যকর হয়েছে, সেখানে ''নেতিবাচক নানা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে''। চীনে ব্যক্তি-মালিকানাধীন সেক্টর দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক কাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রকে দুর্বল করে দিচ্ছে; ২০০৫-এর মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে যুক্ত মূল্যের (value added) অর্ধেকই আসছে ব্যক্তিমালিকানাধীন সেক্টর থেকে, এবং সেখানে কর্মরত রয়েছে সরকারি ক্ষেত্রে কর্মরতদের দ্বিগুণেরও বেশি লোক। ফলত, অর্থনৈতিক বৃদ্ধির খুবই উঁচু হার এবং এখনও শিল্পক্ষেত্রে সরকারি সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকলেও, ক্রমবর্ধমান আয়গত বৈষম্য, বেকারি এবং দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ ক্রমশ প্রচণ্ড সমস্যা ও দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠছে। পুঁজিপতিদের ও ব্যবসাদারদের পার্টিতে সদস্য হিসেবে ঢুকবার সুযোগ করে দেবার ফলে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক দিশা বিপথে যাবার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের ধারণাটিকেই চীনের পার্টির ধারণা থেকে ছেঁটে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলত সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের তরলীকরণের। তবুও কিন্তু চীনের বর্তমান অধঃপতিত পার্টি-নেতৃত্বের লেজুড়বৃত্তি তাঁরা আজও পুরোপুরি ছাড়তে পারেন নি। তাই এতো সবের পরেও তাঁরা চীনকে 'সমাজতান্ত্রিক' বলে অভিহিত করছেন। এই 'অনীক' পত্রিকাতেই বহু বছর আগে তরুণ রায়ের একটি প্রবন্ধে পড়েছিলাম, লেখক সিপিআই(এম)-এর 'আধুনিক সংশোধনবাদের প্রধান পান্ডা' সোভিয়েত পার্টির সমস্ত বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাকে 'সমাজতান্ত্রিক' বলে সার্টিফিকেট দেওয়াটাকে সুকুমার রায়ের 'পাত্র চাই' কবিতার 'তবুও তারা উচ্চ ঘর, কংসমামার বংশধর' বলার সঙ্গে তুলনা করে ব্যঙ্গ করেছিলেন। একই কথা নিঃসন্দেহে সিপিআই(এম)-এর বর্তমান চীন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

(দুই) এরপর আমরা দেখবো ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া প্রভৃতি প্রভৃতি লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশের সাম্প্রতিক ভূমিকা সম্পর্কে সিপিআই(এম)-এর অবস্থান। সম্প্রতিকালে লাতিন আমেরিকার এই সব দেশে সাম্রাজ্যবাদ ও তার নয়া উদারবাদী আগ্রাসী অভিযানের বিরুদ্ধে বিপুল গণজাগরণের পরিণতিতে যে সরকারগুলি গঠিত হয়েছে, সিপিআই(এম)-এর এবারের মতাদর্শগত দলিলে সেগুলিকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয়েছে (প্যারা ৭.১-৭.৮): সেগুলি কোনো সমাজতান্ত্রিক বিকল্প না হলেও, সাম্রাজ্যবাদ ও তার নয়া উদারবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ গড়ে তোলার 'আত্মগত উপাদান' ('subjective factor') হিসেবে কাজ করছে। গত কয়েক বছর ধরে সমাজতান্ত্রিক কিউবা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত এই দেশগুলি তাদের সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভরতা অনেকটা কমিয়ে ফেলেছে; কতটা বলিষ্ঠভাবে তারা সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপকে প্রতিহত করতে পারবে— তার উপর অনেকটাই নির্ভর করবে তাদের সাফল্য। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে দুনিয়াজোড়া লড়াইকে জোরদার করে তোলার ক্ষেত্রে এই জনপ্রিয় ও প্রগতিশীল শক্তিগুলি আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে।

সিপিআই(এম)-এর এই বক্তব্য সম্পর্কে আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ আপত্তির কারণ না থাকলেও কিছু প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। লাতিন আমেরিকার এই সব সমাজতন্ত্র-অভিমুখী প্রবণতার একটি নতুন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এগুলি চিরাচরিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মতো মূলত সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন শ্রেণীভিত্তিক পার্টি বা সরকার নয়, বরং আদিবাসী সমাজ-সহ সমস্ত নিপীড়িত মানুষের আন্দোলনের ভিত্তিতে সংগঠিত। ওই সব দেশের মেহনতি মানুষেরা চিরাচরিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ব্যর্থতায় বীতশ্রদ্ধ হয়েই এই ব্যাপক আন্দোলন-ভিত্তিক দলগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। স্বভাবতই দুনিয়ার, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার বামপন্থীরা লাতিন আমেরিকার এই সব এক্সপেরিমেন্টগুলির ভবিষ্যৎ অভিমুখ নিয়ে এবং নিজ নিজ দেশে সেগুলির অনুশীলনের সম্ভাব্যতা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছেন। পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপুল সাফল্য সত্ত্বেও, পার্টি-নেতাদের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং ব্যাপক মানুষের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রকৃত সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে জনগণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যর্থতাই যে সেগুলির পতনের প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করেছে— এই উপলব্ধিও লাতিন আমেরিকার এই সব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেবার তাগিদ বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত সিপিআই(এম)-নেতৃত্বের মধ্যে— কি দলীয় পরিচালনা, কি সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে— সামান্যতম লক্ষণ মেলে নি, যা তাঁদের লাতিন আমেরিকার এই অভিজ্ঞতার থেকে শিক্ষা নেবার

এর পর ২৭ পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধ

আশ্রয়হীন মানুষকে উপযুক্ত আশ্রয় দেবার দায় সরকারের

নব দত্ত

কাউকেই উচ্ছেদ করা হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী জনসভায় জানিয়েছেন। সরকারের এই আশ্বাসে ভরসা রেখে, নোনাডাঙ্গায় অনশন তুলে নেওয়া হচ্ছে। ভেঙ্গে দেওয়া ঘর/ঝুপড়ি আবার পুনর্গঠিত হয়েছে। স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবিতে মিছিল, সভা হচ্ছে, এর মধ্যে আবার 'পরিবর্তনপন্থী' সরকারের 'বন্ধু'দের ঐকান্তিক উদ্যোগে উচ্ছেদের সমর্থনে কিছু নাগরিকের সভাও ওখানে হয়েছে। পাশাপাশি পুনর্বাসিত মানুষের সাথে, পুনর্বাসিত হবেন এমন মৌখিক আশ্বাসে বিশ্বাসী অস্থায়ী ঝুপড়ি/বস্তির বাসিন্দাদের একাংশকে 'মজদুর পল্লী'র উচ্ছেদের সমর্থনে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। সরকার মানুষদের উচ্ছেদ করতে এক কৌশল অবলম্বন করেছে। সেখানে সমস্ত জায়গাটিকে ঘিরে বেড়া দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই মাঝখানে আটকে পড়া বাসিন্দারা প্রতিবাদ করলেন। পুলিশের উপস্থিতিতে মারধোর-ধরপাকড় হল। আবার ১১জন বস্তিবাসী গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সবারই দাবি পুনর্বাসিত মানুষের জন্য উপযুক্ত পরিষেবা চাই। যারা পাকা বাড়িতে পুনর্বাসন পাননি, আপৎকালীন আশ্রয় হিসাবে অস্থায়ী কলোনি গড়ে তুলেছেন। আসলে গোটা পুনর্বাসন প্রক্রিয়াটা অগোছালো, অপরিকল্পিত। বিভিন্ন সময়ে নানান রাজনৈতিক ব্যাধ্যবাধকতায় পুনর্বাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থাকে পাল্টে ফেলা হয়েছে। পূর্বতন সরকারের সময়ে এসব হয়েছে। খাল সংস্কার, রাস্তা সম্প্রসারণ ইত্যাদির প্রয়োজন দেখিয়ে বস্তি উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এইসব প্রকল্পে বিদেশি ফান্ড/ব্যাঙ্ক/এজেন্সি টাকা দিচ্ছে। তাদের জোরালো দাবি, উচ্ছেদ হওয়া মানুষের বিকল্প পুনর্বাসন দিতে হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তার ব্যবস্থা হচ্ছে—প্রকল্প ততক্ষণ ছাড়পত্র পাবে না। এই ধরনের চাপের মুখে পড়ে ঋণদানকারী সংস্থার দাবি মেনে নেওয়ার ভান করে এমনও হয়েছে যে বাড়ি নির্মাণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্মাণ সংস্থাকে কলকাতা পৌরসভা ডেকে নিয়ে হাতে টাকা তুলে দিচ্ছে, কিন্তু কোথায় পুর্নবাসন হবে? পুনর্বাসনের জন্য স্থিরীকৃত জমির হাতবদল করা হয়নি, কিন্তু প্রকল্পের শর্তানুযায়ী আর্থিক সংস্থার কাছে পুনর্বাসন বার্তা চলে গেছে। পুনর্বাসন প্রকল্পের কাজ চলছে। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে হয়েছে।

বিশ্বব্যাঙ্ক সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যাঙ্ক-এর সহায়তায় গড়ে ওঠা প্রকল্পে মানুষের উচ্ছেদ ও পুনর্বাসনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে একটি নিজস্ব মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি করেন। 'Direction in Development' শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত রিপোর্টটির নামকরণ করা হয়েছে, 'The Economics of Involuntory Resettlement : Questions and Challenges. বিশ্বব্যাঙ্কের মনোনীত গবেষকরা অসংখ্য ঘটনা এবং প্রকল্প-পরবর্তী মূল্যায়ন এখানে তুলে ধরেছেন। এই রিপোর্ট-এ দেখানো হয়েছে, উন্নয়নের নামে উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে শাসক-সরকার কত অমানবিক কাণ্ডকারখানা চালিয়েছে। ওই রিপোর্ট উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন সম্পর্কে শাসক ও তাদের সমর্থকদের মনোভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে। এমন প্রচার করা হয়, এই সব ঝুপড়ি/বস্তিতে যৌনকর্মীরা থাকেন, ড্রাগ ব্যবসায়ীরা থাকে, চোর গুন্ডা ইত্যাদি এই ধরনের মানুষের এখানে বসবাস, ফলে এদের উচ্ছেদ যুক্তিযুক্ত। বলা হয়, পুনর্বাসনে যে 'মানবিক' বস্তুটি হাজির করা হচ্ছে সেটা নিয়েই তোমরা সন্তুষ্ট থাকো। এটা তোমার অধিকার নয়, এটা শাসকের অনুগ্রহ। এটা ভাবার কোন কারণ নেই, বামফ্রন্ট সরকার বা তার পরিচালিত পুরসভা এই মনোভাবের ভিন্ন কিছু ছিলেন। ভাবা গেছিল, পূর্বতন সরকারের সময়ে এসব হলেও 'বদলের' সরকার অন্যরকম হবে, সুষ্ঠু পুনর্বাসন নীতি গ্রহণ করা হবে। বলতে বাধ্য হচ্ছি কিছুই পাল্টায়নি, সবই একরকম চলছে। আসলে এডিবি (এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক) অনুমোদিত প্রকল্পে পুনর্বাসন সম্পর্কিত ব্যবস্থাটা ঠিক কী ছিল? একটা বিষয় স্পষ্ট ভাবেই বলে নেওয়া দরকার, এডিবির নির্ধারিত পুনর্বাসন নীতি মেনে পুনর্বাসন আগেও কোথাও হয়নি, এখনও হচ্ছে না।

এখন আন্তর্জাতিক পুঁজি সংস্থাগুলি চায় না তাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আসুক যে তাঁরা প্রকল্পে নির্ধারিত পুনর্বাসন নীতি মানেনি, বিশেষত টাকাটা যখন ঋণ হিসেবেই দেওযা হচ্ছে। আসলে পুনর্বাসন-জনিত খরচটা তো প্রকল্পের ঋণের মধ্যেই ধরা থাকছে। গরিবদের মধ্যে অনেক রকম ভাগ— যেমন, স্বীকৃত বস্তির মানুষ, ফুটপাতবাসী, জবরদখলকারী, অবৈধ বস্তিবাসী বা এডিবি-বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্পের আওতায় থাকা গরিব। এদের প্রত্যেকের জন্য সরকারের রাজনৈতিক অবস্থান এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম, আর গন্ডগোলটার শুরু সেখানেই। যেমন ধরুন, পূবর্তন সরকারের সময় থেকেই নোনাডাঙ্গার ক্ষেত্রে প্রশাসন, ক্ষমতাসীন দলীয় নেতা, মন্ত্রীরা নানান রকম মন্তব্য করেছেন, সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এই তো কয়েকবছর আগে সল্টলেক স্টেডিয়ামের উল্টোদিকে ভগৎ সিংহ কলোনির মানুষরা উচ্ছেদ হলেন। প্রায় ২০০ জনের পরিবার, সরকার পুনর্বাসন দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল, কিন্তু পুনর্বাসন হবে কোথায়? নোনাডাঙ্গার প্রকল্পে কথা ছিল স্থায়ী বাজার হবে, বলা ছিল স্বাস্থ্যকেন্দ্র হবে, প্রাথমিক স্কুল হবে। পঞ্চান্নগ্রামের পোড়াবস্তির বাসিন্দাদের পুনর্বাসন হবে কোথায়— হবে ওই নোনাডাঙ্গায়, ঐ খালি জায়গায় যেখানে কিছুকাল হল বসবাস করছেন বেশ কিছু

পরিবার। মজদুর পল্লীতে। নোনাডাঙ্গার যে অঞ্চলকে ঘিরে সাম্প্রতিক সরকারি উচ্ছেদ চলছে। পাশাপাশি উচ্ছেদ রুখতে পুনর্বাসনের দাবিতে প্রতিবাদ/প্রতিরোধ সংগঠিত হয়েছে, গড়ে উঠছে উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। এই খালি জায়গার চারধারে কিছু দিন আগে পর্যন্ত সাইনবোর্ড লাগিয়ে বলা ছিল— এই জমিতে কোনও পুনর্বাসন হবে না। তাহলে ঐ জায়গায় কী হবে? এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর সরকার, পুর-নগর উন্নয়ন দপ্তর, কেএমসি-কেইআইপি, কেএমডিএ, কোন সংস্থাই দেননি। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার খালপাড় উচ্ছেদ, রাস্তা সম্প্রসারণ, প্রভৃতি কারণে কোন ধরনের উচ্ছেদের ঘটনাতেই শুরু থেকেই প্রশাসনিক স্তরে পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের বিরোধী ছিলেন, তাই ২০০০ সালের ১০ ডিসেম্বর, মানবাধিকার দিবসের দিনে বেলেঘাটা খালপাড় উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে, পুলিশ ও শাসকদলের গুন্ডারা কার্যত তান্ডব চালায়, শুধু গরিব মানুষের ঘর ভাঙেনি, ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, ব্যাপক লাঠি ও গ্যাস চালিয়েছে, এবং বহু প্রতিবাদী মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে। কবি অরুণ ভট্টাচার্য সহ হকার্স সংগ্রাম কমিটির অনেকেই গ্রেপ্তার হন। বেশ কয়েকদিন জেলেও থাকেন। এখনও সেই কেস চলছে। এরা কেউই পুনর্বাসন পাননি। টালিনালার উচ্ছেদে কয়েক হাজার পরিবার উচ্ছেদ হয়, মাত্র ২০০টি পরিবার পুনর্বাসন পেয়েছেন, তাও হয়েছে তৎকালীন বামফ্রন্টের শরিক আরএসপি-র সক্রিয় প্রতিবাদে। সরকার ন্যূনতম পুনর্বাসনে রাজি হয়। এই সময়ে খালসংস্কার মূলত সেচ-দপ্তর ও কেএমডিএ-র উদ্যোগে হয়। কিন্তু পরবর্তীতে যে খালপাড় ও রাস্তা সম্প্রসারণ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে উচ্ছেদ হয়, এইসব প্রকল্প বিদেশি ফান্ড/এজেন্সির অর্থানুকূল্যে রূপায়িত হয়, ফলত তাদের শর্ত মেনে পুনর্বাসন হিসাবে বিকল্প বাসস্থান, দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সরকার বাধ্য হয়। সরকার কোনো নীতিগত অবস্থান মেনে বা মানবিক মনোভাব নিয়ে তাঁদের কার্যকালের মেয়াদের শেষ সাত-আট বছর উচ্ছেদের ক্ষেত্রে পুনর্বাসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি। যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা ঋণদানকারী সংস্থার চাপে পড়ে। অপরিকল্পিত, অগোছালো, যৎসামান্য যাই হোক কোনও একধরনের পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নোনাডাঙ্গা ও এই ধরনের ঝুপড়ি/বস্তি, খালপাড়, ফুটপাত সব জায়গা থেকেই উচ্ছেদের পক্ষে সরকারি মতামত ও তাদের সমর্থক মানুষদের বক্তব্য থাকে—এবং যা লক্ষণীয় হল, এখানেও সেই একই কথা বলা হচ্ছে— এঁরা হলেন 'জবরদখলকারী'। প্রশ্ন হল, ঝুপড়িতে যাঁরা বসবাস করেন, কবে আর তাঁরা আইনসম্মত বসবাসের অধিকার নিয়ে থাকতে শুরু করেন? এটা গোটা দেশের, এমনকি তৃতীয় বিশ্বের সব দেশেরই সাধারণ ছবি। যাঁরা ঝুপড়ি, বস্তি থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন, তাঁরা বারবার স্থানান্তরিত বা নির্বাসিত হয়েছেন। দেশভাগ, দাঙ্গা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি '৮০-র দশক থেকে তথাকথিত 'উন্নয়ন'জনিত কারণে মানুষ উচ্ছেদ হচ্ছেন, হয়েই চলেছেন। রাষ্ট্রসংঘ এঁদের নামকরণ করেছে 'উন্নয়নের ফলে উদ্বাস্তু'।

নোনাডাঙ্গায় বা অন্য কোথাও পুনর্বাসিত হওয়ার অধিকার এঁদের নেই— কারণ এঁরা খুব সম্প্রতি এসেছেন। কেউ বলছেন ছয় মাস কেউবা আবার বলছেন—আরও বেশি। সরকারের পক্ষে স্বনিযুক্ত 'বন্ধু'রা বলছেন, সরকারকে বিব্রত করতে কিছু দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ টাকাপয়সা নিয়ে এদের এখানে বসিয়েছেন। কবে এঁরা ওখানে এসে প্রথম থাকতে শুরু করলেন সেসব নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই— কারণ আশ্রয়হীন মানুষের আশ্রয় পাবার অধিকার রয়েছে— এটা সাংবিধানিক অধিকার (Right to Shelter)। এবং এটাও গ্রাহ্য নয় যে তার একটা cut-off date বলে কিছু থাকতে হবে।

খালপাড়ের মানুষ— উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন

আজকের নোনাডাঙ্গায় কারা বসবাস করতে এলেন— সরকারি পুনর্বাসন পেয়ে বাড়িতে বা পুনর্বাসনের অপেক্ষায় ঝুপড়িতে বস্তিতে?

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে খালপাড়ে যাঁদের বসবাস, জীবনজীবিকা নির্বাহ, তাঁদের সবাইকে চলে যেতে হবে, যেতে হচ্ছে। টাকা দিচ্ছে এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, উচ্ছেদ সম্পাদন করছে কেইআইপি— যার পুরোটা হল কলকাতা এনভায়রনমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট বা কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। এডিবি-র টাকায় চলছে প্রকল্প। রাজ্য সরকারের সহায়তায় এই প্রকল্প, রূপায়ণের দায়িত্বে কলকাতা পুরসভা।

এডিবি ১৯৯৯ সালে কলকাতা শহরের পরিবেশের উন্নতির উদ্দেশ্যে কেইআইপিকে ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিলো :

১। কলকাতা শহরের বাইরের অংশের (outer area) নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি।

২। শহরের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার উন্নতি (Solid waste Management)

৩। কম আয়ের এলাকায় ব্যয়সাধ্য ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা দিয়ে দারিদ্র্য দূর করা।

৪। অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সম্প্রদায়টিকে ক্ষমতাশালী করা।

৫। খাল সংস্কার করে বন্যা প্রবণতা কমানো।

৬। উন্নয়নজনিত ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা।

৭। শহরের পুরদপ্তরগুলিকে ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের ক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলার মাধ্যমে কার্যকর স্বশাসিত ও স্বনির্ভর পুরসভায় পরিণত করা।

এই প্রকল্প ব্যয়ের বেশিরভাগ অংশই এসেছে এডিবি-র ১,০১২ কোটি টাকা থেকে। পাঁচ বছর গ্রেস পিরিয়ড সহ ২৫ বছরের মেয়াদি টাকা অনুদান হিসেবে এডিবি দিয়েছে। ডিএফআইডি ১৯০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ

সরকার ২৫১ কোটি ও কলকাতা পুরসভা ২৫৪ কোটি টাকা দিয়েছে। এক্ষেত্রে এডিবি-র ঋণের শর্ত হলো :

১। কলকাতা পুরসভার ২০ মিলিলিটার বা তার বেশি মাপের ফেরুল ব্যবহারকারী সমস্ত উপভোক্তাদের ক্ষেত্রে জলের মিটার বসাতে হবে।

২। বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশমত ধাপে ধাপে ২০ মিলিলিটারের কম মাপের ফেরুল ব্যবহারকারী সমস্ত উপভোক্তার ক্ষেত্রে জলের মিটার বসাতে হবে, (২০০২-০৩ সালের মধ্যে ২৫ শতাংশ, ২০০৩-০৪ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ এবং ২০০৪-০৫ সালের মধ্যে ১০০ শতাংশ) এবং ২০০৯-১০ সালের মধ্যে সমস্ত ধরনের উপভোক্তাদের ক্ষেত্রেই জলের মিটার বসাতে হবে।

৩। কলকাতা পুরসভা সম্পত্তি করের সংস্কার করবে। লক্ষণীয় হল, এই শর্তগুলির সাথে জহরলাল নেহেরু ন্যাশনাল আরবান রিনিউয়াল মিশনের (জেএনএনইউআরএম) শর্ত-সমূহের মিল রয়েছে।

আসলে এডিবি ও বিশ্বব্যাঙ্ক প্রদত্ত টাকায় চলা প্রকল্পে উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন সম্পর্কে এই যে অবস্থানগত সিদ্ধান্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি তার একটা প্রেক্ষাপট রয়েছে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে বিশ্বের নানা দেশে বিভিন্ন প্রকল্পে লাখ লাখ মানুষ উচ্ছেদ হয়েছেন। এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিবাদী মানুষ। এমতাবস্থায় বিশ্বব্যাঙ্ক ও তার সহযোগী এডিবির মতো সংস্থা উচ্ছেদ-হওয়া মানুষের পুনর্বাসনকে ঋণ পাওয়ার অন্যতম শর্ত হিসাবে আরোপ করে। ১৯৯৫ সালে এডিবি অনিচ্ছুক উচ্ছেদ পুনর্বাসন নীতি (Policy on Involuntary Resettlement) তৈরি করে, কেইইআইপির ক্ষেত্রেও এডিবি এই একই নীতি গ্রহণ করে। প্রাথমিকভাবে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার এডিবি-র পুনর্বাসন প্রস্তাব মানেনি, সরকারের বক্তব্যে প্রকাশিত, সরকার তথাকথিত 'বে-আইনি' দখলদারদের পুনর্বাসনে আগ্রহী ছিল না। কিন্তু এডিবি-র ঋণদানের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতি বাধ্যতামূলক করার জন্যই প্রাক্তন সরকার পুনর্বাসন নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এমনকি বামফ্রন্ট সরকারের তরফে দখলদারদের এককালীন কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে উচ্ছেদ করার প্রস্তাবেও এডিবি রাজি হয়নি। যদিও এডিবি-র তরফে প্রথম প্রস্তাবে বাড়ি-ভিত্তিক পুনর্বাসন থাকলেও পরবর্তীতে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবমত ফ্ল্যাট-ভিত্তিক পুনর্বাসনে তারা রাজি হয়। পুনর্বাসন প্রস্তাব অনেকাংশেই সংশোধন করা হয়। আসলে গন্ডগোলের ভয়-অসন্তোষের সূত্রপাত উচ্ছেদ হওয়া মানুষের তরফে সেই সময় থেকেই।

২০০২ সালে টালিনালার বিস্তীর্ণ অংশে এবং বেলেঘাটা সার্কুলার খালের দুধারে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করা হাজার হাজার মানুষকে উচ্ছেদ করা হয়, অথচ তাঁরা পুনর্বাসন পান নি (তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের শরিক আরএসপি-র তীব্র আপত্তিতে টালিনালার উচ্ছেদ হওয়া শ দুয়েক পরিবার পুনর্বাসন পান)।

এডিবি-র শর্তই হল পুনর্বাসন না দিয়ে গরিব মানুষকে উচ্ছেদ করা যাবে না।

আসুন এবার দেখে নিই, পুনর্বাসন পরিকল্পনায় মূল ডকুমেন্টে কী বলা ছিল?

কেইআইপির জন্য কলকাতা পুরসভার তৈরি পুনর্বাসন পরিকল্পনা দলিল বা Resttlement Planning Document বলা হয়েছে :

এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল, যাদের ঘর ভাঙ্গা যাবে, জীবিকা হারাবেন বা অন্য সম্পদের ক্ষতি হবে, তাঁদের অন্তত আগের অবস্থায় পৌঁছে দেওয়া বা অবস্থার আরও উন্নতি করা। এর জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের কোনও খরচ করতে হবে না। এই লক্ষ্য অর্জন করতে প্রকল্প থেকে যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা হল : ১। ক্ষতি-গ্রস্তদের সম্পত্তি এবং জীবিকা ও আয়ের ক্ষতিপূরণ করা; ২। পুনর্বাসন কেন্দ্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা ও পরিষেবা তৈরি করে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে সাহায্য করা; ৩। ক্ষতিগ্রস্তদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করা, যাতে সাধারণভাবে তাঁদের উন্নতি হয়, অন্তত আগের অবস্থায় ফিরে আসেন।

কেইআইপি-পুনর্বাসন দলিলে পরিষ্কার বলা হয়েছে, খালপাড় বাসিন্দাদের আইনি স্বত্ব আছে কি নেই, তা একেবারেই বিচার্য নয়। যাঁদের সচিত্র পরিচয়পত্র সমীক্ষার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই পুনর্বাসন পাওয়ার অধিকারী বলা হয়েছে। যতদূর সম্ভব, উচ্ছেদ এড়ানো হবে। যেসব ক্ষেত্রে উচ্ছেদ অপরিহার্য, সেই সব ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের তাঁদের বর্তমান অবস্থানের খুব কাছাকাছি পুনর্বাসন দেওয়া হবে, যাতে তাঁরা বর্তমান জীবিকা চালিয়ে যেতে পারেন। এই দূরত্ব সর্বাধিক ৮০০ মিটার এবং অপরিহার্যক্ষেত্রে ২ কিলোমিটারের বেশি হবে না। আরও বলা হল, পুরো পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সঙ্গে আলোচনা করে ও তাঁদের সঙ্গে নিয়ে (Partici-patory Manner) করা হবে। প্রকল্পের অংশ হিসাবে Social Development করা হবে।

বলা হল ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে যাঁদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ বা পাঁচের কম, তাঁদের জন্য ১৭ বর্গমিটার (১৮৩ বর্গফুট), আর যে পরিবার পাঁচ জনের বেশি সদস্য বা তিনজন প্রাপ্ত বয়স্ক, তাঁদের ২০ বর্গমিটার (২১৫ বর্গফুট) জায়গা দেওয়া হবে। ঠিক করা হল, কেন্দ্রীয় সরকারের বাল্মীকি আবাস যোজনা বা VAMBAY প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রধানত চারতলা উচ্চতার স্বল্পমূল্যের ফ্ল্যাট বানিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া হবে, ফ্ল্যাট পিছু ব্যয় ৭৮,৬০০ টাকা (পরে যা ৮৪ হাজার টাকা হয়)। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান ৩০ হাজার টাকা, ফ্ল্যাট প্রাপক দেবে পাঁচ শতাংশ, প্রথমে ছিল ৩,৯৪০ টাকা, পরে হয় ৫০০০ টাকা। বাকি অর্থ সংস্থান হবে কেইআইপি থেকে। রাজ্য সরকার জমির ব্যবস্থা করবে, প্রতিটি ফ্ল্যাটের মাপ হবে ১৯০ বর্গফুট, ক্ষতিগ্রস্তদের ৯৯ বছরের অবিক্রয়যোগ্য লিজে ফ্ল্যাট দেওয়া

হবে, লিজ হবে পরিবারের প্রধান মহিলার নামে, ফ্ল্যাট দেওয়া হবে লটারি করে, এর মধ্যে যাঁদের দোকানঘর আছে বা যাঁরা বৃদ্ধ/বৃদ্ধা তাঁদের একতলায় ফ্ল্যাট দেওয়া হবে।

পুনর্বাসন প্রকল্পে বলা হয়েছে : প্রতিটি পুনর্বাসন কেন্দ্রের ফ্ল্যাটের ন্যূনতম পরিষেবার ব্যবস্থা থাকবে। যেমন, ১) ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকবে; ২) প্রতিটি ফ্ল্যাটে টয়লেট থাকবে; ৩) প্রতিটি ফ্ল্যাটে পাইপে করে জলের সংযোগ থাকবে; ৪) কলকাতার পুরসভার পক্ষে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকবে; ৫) ৬-১০ মিনিট পাঁয়ে হেটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ থাকবে। এ তো গেল প্রকল্পে যা থাকবে বলে বলা হয়েছে তার বয়ান। কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্যাম্বে ও বিএসইউপি প্রকল্পে তিনতলা বা চারতলা ফ্ল্যাট বাড়ি বানিয়ে যে পুনর্বাসন দিয়েছে তার চেহারা কী রকম? ২০১০-এ কলকাতা পুরসভার পূর্বতন মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্য-এর কাছে নোনাডাঙ্গা ও খালপাড়ের বাসিন্দারা একটি ডেপুটেশন দিয়েছিলেন। বিকাশবাবু বলেছিলেন, কীসের অভিযোগ? এমন পুনর্বাসন সারা বিশ্বে কোথাও হয়নি। আসলে তিনি রঙিন ছবিতে বাড়ীগুলি দেখেছিলেন তাই হয়তো এমন ধারণা হয়েছিল। ২০০৯-এর ২১ সেপ্টেম্বর, নাগরিক মঞ্চের এক প্রতিনিধি দল বিভিন্ন খালপাড়ে উচ্ছেদ হওয়া মানুষ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত অবস্থা জানতে অঞ্চলগুলি ঘুরে দেখেন, তাঁদের বক্তব্য শোনেন। নোনাডাঙ্গায় সমীক্ষক দল যা দেখেছে তাঁর একটি বিশদ রিপোর্ট ৩০ নভেম্বর, ২০০৯ প্রকাশ করা হয় এবং এডিবি, কেইআইপি, কলকাতা পুরসভা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী সবাইকে দেওয়া হয়। নোনাডাঙ্গায় সমীক্ষা করতে গিয়ে যা দেখেছি : এক কামরার ফ্ল্যাট ঘর, ১৫ ফুট লম্বায়, ১০ ফুট চওড়ায় এবং উচ্চতায় ৯ ফুট ২ ইঞ্চি। ঘর সংলগ্ন এক চিলতে ব্যালকনি বা বারান্দার মাপে সাড়ে তিন বাই সাড়ে ছ'ফুট; ব্যালকনির একধারে ঘরের অংশ থেকে আড়াই ফুট বাই চারফুট কেটে নিয়ে টয়লেট। ঘরে একটা লোহার ফ্রেমের কাঁচের জানালা, মাপ ৪ ফুট বাই ৫ ফুট। আলাদা কোন রান্না ঘর নেই, বারান্দায় বা ঘরের কোণায় রান্না করতে হবে। ফ্ল্যাটে ঢোকার মূল দরজা কংক্রিটের। দরজার ফ্রেমও কংক্রিটের। লোহার দরজা সাড়ে ছ'ফুট বাই তিনফুট। অধিকাংশ জায়গায় এক কামরার ফ্ল্যাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, ছাদে ফাটল, দেওয়ালে নোনা, অগভীর সেপটিক ট্যাঙ্ক উপচে পড়েছে, সিমেন্টের দরজায় চিড় ধরেছে, পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা, বিশেষত 'বৃহত্তর কলকাতা খালপাড় ও বস্তি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি একাধিকবার হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে মিছিল, ডেপুটেশন, সভা ইত্যাদির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্যাগুলি রেখেছেন। কখনও কেইআইপি বলেছে, আমরা জানি না, বিষয়টা কেএমসি দেখবে। কেএমসি বলেছে, সরকারের নগরোন্নয়ন দপ্তর দেখবে। নগরোন্নয়ন দপ্তর বলেছে, কেএমসি-র সাথে কথা চলছে খুব শীঘ্রই সমস্যা মিটবে। এভাবেই বছরের পর বছর কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসলে গোটা পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় গোড়া থকেই গলদ শুরু হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে যাদের ছবিসহ পরিচয়পত্র দেওয়া হবে তাঁরাই পুনর্বাসন পাবেন। দুটি এনজিও-কে দায়িত্ব দেওয়া হল। দুপুরবেলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঝুপড়ি-বস্তির বাসিন্দারা যখন কাজে বাইরে রয়েছেন সেই সময়ে সমীক্ষাকারী এনজিও প্রতিনিধি এলেন— যা দেখলেন তাই লিখলেন। একটা ঝুপড়িকে দুভাগে বা তিনভাগে ভাগ করে দু-তিনটি পর্যন্ত পরিবার বাস করেছেন, সেখানে একটি ঝুপড়িতে একটি পরিবার ধরে ছবি করা হল এবং সেই সময় পরিবারের যে বয়স্ক মানুষকে পাওয়া গেল তাঁর স্ত্রী/মা এদের নাম নথিভুক্ত হল। পরে বাড়ীতে ফিরে অন্যরা যখন সব শুনে সমীক্ষকদের ধরলেন বা কেআইপি কর্তৃপক্ষকে জানানো হল, তাঁরা বললেন, আপাতত নির্দেশমত এইভাবে পুনর্বাসন হোক, পরে তোমাদেরটা দেখা যাবে। যাদের দোকান ভাঙ্গা পড়ল তাঁদের ঘর দেওয়া হল— অনেকে নিলেন, অনেকে নিলেন না, কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, জীবিকা কোনো বিকল্প ব্যবস্থা কি হল? কথা ছিল— দু থেকে আড়াই কিলোমিটার মধ্যে পুনর্বাসন হবে। যেখানে উচ্ছেদ হওয়া মানুষ পুনর্বাসন পেয়েছেন ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার দূরত্বে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি নোনাডাঙ্গার নিকাশি জলসরবরাহ নিয়ে সরকারি কাজের টেন্ডার করা হচ্ছে, বাজার গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। স্কুল ও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে। এবং এসবই সরকারের তরফে বা সরকারি সমর্থকরা বলছেন যখন সাম্প্রতিক উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি আন্দোলন গড়ে তুলছেন।

অনেক অসন্তোষ, বিক্ষোভ প্রতিবাদ, প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফান্ড/ব্যাঙ্ক সহায়ককারী প্রকল্প শিকেয় উঠেছে বা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় বিশ্বব্যাঙ্কের মত সংস্থাও প্রকল্পের সাথে যুক্ত পুনর্বাসন প্রকল্পে কী ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে তাঁর পরামর্শ দিয়েছেন। ২০ দফা এই পরামর্শের মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য একটা ঘর দিলেই হবে না। তার পরিষেবা, পরিকাঠামো যাতে ব্যবহারযোগ্য থাকে, তার নিয়মিত দেখভাল ব্যবস্থা রাখতে হবে। যাঁরা উচ্ছেদ হলেন তাঁদের আয়ের ব্যবস্থা যাতে সঠিক থাকে তার দিকে নজর দিতে হবে। যাঁদের আয় চলে যাবে তাঁরা যাতে আয়ের সংস্থান করতে পারেন তার দায়িত্ব প্রকল্প রূপায়ণকারীদের নিতে হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় সরকার, সহযোগী ক্ষমতাবান সামাজিক গোষ্ঠী, এঁরা প্রত্যেকেই ততদূর পর্যন্ত 'মানবিক' হতে রাজি হয়েছেন যতদূর পর্যন্ত প্রকল্পে অনুমোদন/ অর্থসংস্থান ঋণদানকারীর সংস্থার আবশ্যিক বাধ্যতামূলক শর্তের বিষয় রয়েছে। ভাবখানা এমন, যা দিচ্ছি তাই অনেক। তার আবার ভাল/মন্দ, এত বিশ্লেষণের মূল্যায়নের কী আছে? শর্ত থাকলেও কোথাওই প্রকল্প রূপায়ণ ও পরবর্তী পরিচালনায়

কমিউনিটি অংশগ্রহণ মানা হয়নি।

''সরকার গরীব মানুষকে উচ্ছেদের পক্ষে নয়'' —মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। আমরা সবাই জানি, সংবাদ মাধ্যমে বিষয়টি খুব গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। 'মজদুর পল্লী' উচ্ছেদের প্রতিবাদে অনশনকারীরা এই বক্তব্যে ভরসা রেখেই অনশন তুলে নিয়েছেন। কিন্তু আমরা বিস্মিত হই যখন দেখি, কেএমডিএ-র দখলে থাকা নোনাডাঙ্গার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জমি এবং তার মধ্যে থাকা জলাশয় বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বে-সরকারি কোনো ডেভলপারকে ৯৯ বছরের লিজে দেওয়া হবে জানিয়ে 'ওয়েবসাইটে' প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে কেএমডিএর তরফে। বলা হয়েছে, জমি ব্যবহারে এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (এলইউডিসিপি) নিয়ম মেনেই এই জমি বাণিজ্যিক ব্যবহারে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এই ডেভলপমেন্ট পরিকল্পনায় থাকার বাড়ীঘর নির্মাণ, তারকা-চিহ্নিত হোটেল, মল, মাল্টিপ্লেক্স, রেস্তরাঁ, সার্ভিস অ্যাপার্টমেন্টস, মনোরঞ্জন কেন্দ্র এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহারের সুবিধা থাকবে। এক্ষেত্রে বেসরকারি যে ডেভলপাররা প্রস্তাব পাঠাবেন, তাঁদের এই কাজে অভিজ্ঞ ও রিসোর্সফুল হতে হবে।

নিলাম (Bidding Process) প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত ডেভালপাররা অংশগ্রহণ করবেন, তাঁদের জন্য প্রস্তাবপত্রে বলা হয়েছে, বিভিন্ন অভিজ্ঞতার নিরিখে 'মার্কস' দেওয়া হবে; বলা হয়েছে, ১৬ জানুয়ারি, ২০১২-র মধ্যে প্রস্তাব আসতে হবে।

কেএমডিএ-র তরফে এই প্রস্তাবপত্রে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট ডেভলপার ঠিক করা থেকে চুক্তি ও স্বাক্ষরের কাজ মার্চ ২০১২-র মধ্যে সম্পন্ন হবে। প্রস্তাবটি নিয়ে ১৩ পাতার একটি দলিল প্রকাশ করা হয়েছে, শিরোনাম Request for Proposal (RFP) Selection of Transaction Advisor for Disposal of bulk land of Nonadanga for Comprehensive Development.

আমরা জানি, পূর্বতন সরকারের সময়কালে বহুবার বলা হয়েছে, নোনাডাঙ্গায় পড়ে থাকা জমি (যাতে একাধিক বসতি গড়ে উঠেছে, যেমন ভাই ভাই কলোনি, লেক পল্লী, বিজয় কলোনি ইত্যাদি) নানান প্রকল্পে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। বর্তমান রাজ্য সরকার প্রকাশ্যে অন্যরকম কোনো সিদ্ধান্ত জানাননি। প্রশ্ন হলো, তাহলে কেএমডিএ-র এই প্রস্তাবের অর্থ কী? সরকারি বক্তব্য এক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়। সন্দেহ দানা বাঁধছে। তবে কি এই সরকারি উদ্যোগ বুলডোজার দিয়ে ব্যাপক পুলিশ সহযোগে মজদুর পল্লী উচ্ছেদ ও পরবর্তীতে বেড়া দেওয়া কি কেএমডিএ প্রস্তাবিত কোন ডেভালপারকে জমি তুলে দিতেই?

q সূত্র ঃ নাগরিক মঞ্চ প্রকাশিত খালপাড় উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন প্রতিশ্রুতি-বাস্তব ২০০৯, ৩০ নভেম্বর

সি পি আই (এম)-এর সাম্প্রতিক মতাদর্শগত সিদ্ধান্ত

২২ পৃষ্ঠার পর

এবং তা বাস্তবসম্মতভাবে অনুশীলনের ইঙ্গিত বহন করে। অন্য দিকে, জন্মমুহূর্ত থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতারা কখনোই নিজেদের মাথার ছাতা নিজেরাই তৈরি করার এবং তা মাথায় দেবার যোগ্যতা দেখাতে পারেন নি— সব সময়েই তাদের অন্য কারও কাছ থেকে ধার নিয়ে ছাতা মাথায় দিতে হয়েছে : কখনও তা ব্রিটেন, কখনও রাশিয়া, কখনও আবার চীন। ব্রিটেন বা রাশিয়া থেকে ছাতা আমদানির সম্ভাবনা তো অনেক দিনই শেষ হয়ে গেছে; চীনের ছাতারও বারোটা বেজে গেছে, তবু সেই ছেঁড়া ছাতা দিয়েই এখনও কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। তাই দ্রুত একটা নতুন ও চক্চকে ছাতা খুবই দরকার। সেজন্যই প্রশ্ন জাগে: তাঁদের এই লাতিন আমেরিকা-প্রীতির পেছনে ছাতার জন্য সেই জরুরি তাগিদই কাজ করছে না তো!

সংক্ষিপ্ত সমাচার

সংস্কারের নামে গোছা ধরে বিক্রি

সংস্কারের নামে এবার বিপুল লাভজনক সব নবরত্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিকে গোছা ধরে বেচে দিতে উদ্যত কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার। এর ফলে আরও স্পষ্ট হলো সরকারি বয়ানের মিথ্যাটা। 'সরকারি সংস্থার লোকসান বহন করা সম্ভব নয়' বলে এতদিন ধরে বিলগ্নিকরণের যুক্তি দেওয়া হতো। এবার দেখা গেল, অত্যন্ত লাভজনক সংস্থাগুলিকেই একেবারে গোছা ধরে বেচার ব্যবস্থা হচ্ছে। এর জন্য সরকার খুব গোপনে সমস্ত লাভজনক সংস্থাকে একটি 'সিঙ্গল হোল্ডিং' কোম্পানির অধীনে আনতে পরিকল্পনা নিয়েছে। উদ্দেশ্য, দেশের শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে একেবারে লঘু করে ফেলা। এ প্রস্তাব দিয়েছে যোজনা কমিশনের অধীনস্থ রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির সংস্কারের জন্য গঠিত উচ্চপর্যায়ের কমিটি। কমিটির সুপারিশ কার্যকর হলে সরকারের ভূমিকা থাকবে কেবলমাত্র ভেনচার ক্যাপিটালিস্টের মতো। অর্থাৎ লগ্নি কোথায় করা হবে, করা হবে কিনা, এ জাতীয় সিদ্ধান্ত ছাড়া রাষ্ট্রায় সংস্থার দৈনন্দিন কাজকর্মে রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা থাকবে না। অর্থাৎ সরকার হাত গুটিয়ে নেবে, পরিচালকের ভূমিকায় থাকবে না। ফলে সঙ্গতভাবেই আশঙ্কা থাকছে যে ক্রমশ সংস্থাগুলি অলাভজনক করে তুলে এইসব ক্ষেত্রে বেসরকারি/বহুজাতিককে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে, বলাই বাহুল্য, শ্রমিক ছাঁটাই থেকে শুরু করে দেশের কোষাগারে আয় কমার মতো সংকট তৈরি হতে পারে। কিন্তু তাতে সরকারের কিছুই করার থাকবে না। ''আরও বেশি সংস্কারের'' স্বার্থে উচ্চ পর্যায়ের কমিটির পরামর্শই দ্রুত কার্যকর কারার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দেশের সম্পদ বেচতে উদ্যোগী দেশের সরকার।

প্রবন্ধ

মমতা সরকারের নয়া জমি আইন— সিপিআই (এম)-এর পথ ধরে

প্রণব দে

তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হয়েছিল, 'নতুন সার্বিক জমিনীতি তৈরী করা হবে।' দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৌমেন্দ্রনাথ বসুকে নিয়ে একটা কমিটিও গঠিত হয়েছিল। তাঁরা কী নীতি সুপারিশ করেছিলেন, তা সরকারি স্তরে এখনও ঘোষিত হয়নি। সিঙ্গুর আইন যেহেতু একেবারেই সিঙ্গুর-কেন্দ্রিক, সার্বিক কোন নীতির প্রতিফলন ঘটেনি, তাই সেটাকে ভূমি-নীতির অঙ্গীভূত করা যাচ্ছেনা। 'পশ্চিমবঙ্গ জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন এবং পুনঃসংস্থাপন' নামক একটি বিল ২০১১-এর ডিসেম্বরে বিধানসভার সদস্যদের হাতে দেওয়া হয়। পরে জানা গেল, বিলটি অসাবধানে প্রচারিত হয়ে গেছে। বিধানসভায় বিলটি পেশ করার ইচ্ছা আপাতত সরকারের নেই। পেশ না করা পর্যন্ত কোন বিল সরকারি নীতির প্রকাশ্য পরিচিতি বহন করেনা। সুতরাং মমতা সরকারের ভূমিনীতিটা ঠিক কী, এক বছরেও সঠিক বোঝা গেল না। গত ২ এপ্রিল ২০১২, তৃণমূল জোট সরকারের ভূমি-নীতির প্রথম দলিল আত্মপ্রকাশ করল। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের বিশেষ কয়েকটি ধারা সংশোধন করে বিধানসভায় একটি বিল পাশ হয়েছে। এটাই এখনও পর্যন্ত মমতা সরকারের ভূমিনীতির একমাত্র আইনগ্রাহ্য নিদর্শন। আর যা কিছু শোনা গেছে, সবই মৌখিক, মুখ্যমন্ত্রীর বাণী।

ব্রাত্য ভূমি সংস্কার

ভূমি সংস্কার আইনের আলোচনায় সবথেকে বড়ো সমস্যা হচ্ছে, আধুনিক যে আইনগুলি হচ্ছে, তার সঙ্গে আদতে ভূমি সংস্কারের কোন সম্পর্ক থাকেনা। ভূমি সংস্কার আইনগুলি প্রণীত হয়েছিল, ভূমির উপর নির্ভরশীল কৃষিজীবী মানুষের হাতে ভূমির স্বত্ব নিরাপদ করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। কৃষকদের রক্তঝরা সংগ্রামে অর্জিত আইনী কিছু কিছু বন্দোবস্ত, কৃষি-জমি অকৃষকদের হাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও বাধা সৃষ্টি করত। পশ্চিমবঙ্গও ব্যতিক্রম নয়। একটা সময়ে, ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি ছাড়াও ভূমির উপর নির্ভরশীল অন্যান্য জীবিকার, বিশেষত মৎস্যজীবীদের ক্ষেত্রে, ভূমি সংস্কার আইন প্রসারিত হলো। মোটামুটিভাবে, বিগত শতাব্দীর ৮০-র দশকের শেষ পর্যন্ত, কাগজে-কলমে জমির উপর তাদেরই অগ্রাধিকার স্বীকৃত ছিল, যাদের জমি-কেন্দ্রিক মেহনত করে দিনাতিপাত করতে হতো। ক্ষুদ্র পুঁজি, অল্প বিনিয়োগ, ব্যাপক শ্রম। পরিবেশের সঙ্গে তাদের জীবিকার কোন সংঘাত ছিলনা। থাকলেও, গুরুত্বের বিচারে তা ছিল নগণ্য। ঐ শতাব্দীর ৯০-দশকের 'উদারনৈতিক' অর্থনীতি বিশ্বায়িত হওয়ার পর থেকে এই অগ্রাধিকারের অভিমুখ গেছে বদলে। জমিতে এখন তাদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, যাদের প্রচুর বিনিয়োগ করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু জমি যাদের জীবিকার উৎস নয়। প্রকৃত যারা ভূমিজীবী, তারা উন্নয়ন এবং অগ্রাধিকারের তালিকা থেকে ছাঁটাই হয়ে গেছে। আইনগুলো সংশোধন হচ্ছে সেই লক্ষ্যে। ফলে, যাদের রক্ষা করার জন্য ভূমি সংস্কার আইন রচিত হয়েছিল, তারাই আইনের রক্ষাকবচ হারাচ্ছে। ভূমি সংস্কার আইনে ভূমি সংস্কারই হয়ে পড়েছে ব্রাত্য।

পথ দেখিয়েছিল বামফ্রন্ট

প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল বামফ্রন্ট জমানায়। বিগত শতাব্দীর নবতিতম দশকের মধ্যবর্তী পর্যায় থেকে বৃহৎ কোম্পানীর ক্ষেত্রে জমির ঊর্দ্ধসীমায় ছাড় দিয়ে, সরকারি জমি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দিয়ে, প্রোমটিং-এর স্বার্থে বর্গাদার উচ্ছেদ সুগম করে সিপিএম মন্ত্রীত্ব ভূমি সংস্কার আইনে মৌলিক পরিবর্তন আনতে একের এক বিল আনে। এখন যারা সরকারি পক্ষ, তখন তারা ছিল বিরোধী পক্ষে। যতদূর জানি, এই পর্যায়ের ভূমি-বিলগুলি বিনা বাধায় পাশ হয়ে যায়। ২০০৩ সালে বামফ্রন্ট সরকারের সেজ আইনও বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। বাধাটা এল ২০০৬ সালে। বাধা দিয়েছিল সিঙ্গুরের আন্দোলন। সিঙ্গুরে টাটা মোটর্সের জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, সেই সময়ে ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে, তদানীন্তন ভূমিমন্ত্রী আবদুর রেজ্জাক মোল্লা বিধানসভায় যে বিল পেশ করেন (বিল নং ৩৪), তার উদ্দেশ্য ছিল, 'কেউ শিল্প, বাণিজ্য অথবা পরিকাঠামো নির্মাণকল্পে ঊর্দ্ধসীমার অতিরিক্ত জমি করায়ত্ত করতে চাইলে, সরকারের আগাম অনুমতি নিয়ে সে তা দখল করতে পাড়বে এমন কী হস্তান্তরও করতে পারবে (acquire, hold and transfer land in excess of ceiling limit)'। সিঙ্গুর আন্দোলনের ফলে তদানীন্তন বিরোধীদের বিবেক জাগ্রত হয় এবং সরকারও কিছুটা আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নেওয়ার কারণে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয় এবং মতৈক্য না হওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়।

সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রভাবে আইনের যে পরিবর্তন থমকে গিয়েছিল, সে পরিবর্তন ঘটালো এমন এক সরকার, যারা সিঙ্গুর আন্দোলনের জেরেই ক্ষমতায় এসেছে। সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামের সংগ্রামকে কেউ যদি শুধুমাত্র টাটা বা সালেমের বিরুদ্ধে বা নিছক দলীয় জুলুমবাজির বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে ভেবে থাকেন, যেমন বর্তমান শাসক দল ভাবছেন, তাহলে তিনি বা তাঁরা ঐ আন্দোলনদুটির শুধু তাৎপর্য অনুধাবন করতেই ব্যর্থ হয়েছেন বলা যাবে না, আন্দোলনের গুরুত্বকে অনেক লঘু

করছেন, বলা যাবে। আন্দোলনটা ছিল গরীব মানুষের জীবিকার উৎস রক্ষার, জীবিকার উৎস থেকে বিচ্যুত হওয়ার প্রতিবাদে আন্দোলন। এই সর্বজনীন চরিত্রের কারণেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন ভারতের সাম্প্রতিক কৃষিজীবীদের আন্দোলনে পুরোধা ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছিল। এই প্রেক্ষিতেই মমতা ব্যানার্জি সরকারের সাম্প্রতিক ভূমি সংস্কার আইন সংশোধনীটি পর্যালোচনা করব।

নয়া সংশোধন-নয়া জমিদারদের জন্য

বিগত বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কার আইনের যে ধারাগুলি সংশোধন করে ব্যক্তিগত স্তরে জমির কেন্দ্রীভবনের ব্যবস্থা করেছিল, মমতা সরকারের সংশোধনীর কেন্দ্রবিন্দু মূলত সেই ধারাগুলিই। জমির কেন্দ্রীভবনের পরিসর আরও প্রশস্ত করে নতুন নতুন জমিদার-শ্রেণীর এই সব সৃষ্টি সংশোধনের মূল লক্ষ্য। আলোচ্য বিলে ভূমি সংস্কার আইনের ৪(৪), ৪সি, ১৪কে, ১৪ আর, ১৪ ওয়াই এবং ১৪ জেড ধারাগুলি সংশোধন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইনগুলির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাঠকদের ধৈর্যের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। যে বিষয়গুলি আলোচনা ব্যতিরেকে 'পরিবর্তনের' চরিত্র বোঝা সম্ভব নয়, আলোচনা সেই বিষয়গুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

নয়া জমিদার - ১

ভূমি সংস্কার আইনের ৪(৪) নং ধারায় জমির, বিশেষত কৃষি জমির, অপব্যবহারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আছে। কেউ যদি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত জমির ব্যবহারের ধরণ পাল্টে ফেলে অথবা তিন বছরের বেশি নিজে (অথবা বর্গাদার মারফৎ) চাষ করা বন্ধ রাখে বা চাষ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে অপব্যবহৃত বা অব্যবহৃত জমিটি সরকারের ন্যস্ত হবে। বর্তমান সরকার এই আইন সংশোধন করে 'শিল্প-উদ্যান, শিল্প-তালুক, অর্থ-তালুক, জৈব-প্রযুক্তি উদ্যান, খাদ্য-উদ্যান' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য রায়তকে জমি লীজ দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। এই সুযোগ এতদিন ছিলনা। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় প্রশাসন (মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত ইত্যাদি), অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ, এবং সরকারি কোম্পানীগুলিকে (যেমন হিডকো, শিল্প নিগম ইত্যাদি) 'টাউনসিপ'-এর জমি লীজ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৫-৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে নীট কর্ষিত জমির পরিমাণ ছিল ৫৪.৬২ লক্ষ হেক্টর। ২০১০-১১ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৪৯.৯১ লক্ষ হেক্টর। অর্থাৎ 'উদারনীতি' এই রাজ্যে কায়েম হওয়ার পর ৪.৭১ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষবাস বন্ধ হয়েছে। চাষযোগ্য পতিত জমির (current fallow) পরিমাণও ৩.৫৪ লক্ষ হেক্টর বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় দু' লক্ষ হেক্টর কৃষিজমি চিরতরে ধ্বংস হয়েছে।[২] খাদ্যশস্য উৎপাদনও ক্ষতিগ্রস্থ হতে শুরু করেছে। সারা ভারতে গ্রাম সমাজের কাঠামোয় কৃষকের সংখ্যা কমছে, কৃষি মজুর, কারিগর এবং অন্যান্য অকৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি এমন এক মধ্যস্বত্বাধিকারী শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে, যাদের হাতে কৃষিজমি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে যারা চাষ না করে জমি ভাড়া দেয়। এদের বলা হচ্ছে 'অকৃষি কৃষক' (non- cultivating "peasant" households)। ২০০২ সালে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এইরকম 'অকৃষি কৃষকের' অংশ ছিল ৪১ শতাংশ এবং গ্রামীণ কৃষিজমির প্রায় ১৫ শতাংশ তাদের দখলে ছিল।[৩] সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামীণ রাজনীতিতে এই শ্রেণীর প্রভাব ও প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ভূমি সংস্কার আইনের বাধাগুলি অপসারণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বৃহৎ পুঁজিরও সুবিধা হবে জমি-জায়গা পেতে। বর্তমান সংশোধনীতে গরীব কৃষকের কপাল পুড়লেও, এই নয়া জমিদার শ্রেণীর ফুলে-ফেঁপে ওঠার রাস্তা প্রশস্ত হলো।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেটা জানা দরকার, তা' হলো, ' পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজীবী কৃষক সমিতি বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার' মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের ৭ মে ১৯৯২ তারিখের আদেশে ৪(৪) ধারাটি ১৯৯২ সাল থেকে সংবিধান বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় অকার্যকর হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সরকার যদি জেনেশুনে এই ধারাটি প্রয়োগ করার চেষ্টা করে, তাহলে আদালতের আদেশ অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হওয়া অসম্ভব নয়।

নয়া জমিদার - ২

১৪ আর ধারা বলে স্থানীয় প্রশাসনের জমির ক্ষেত্রে উর্দ্ধসীমা আইন প্রয়োগ করা হতো না। এখন সরকার সরকারি কোম্পানী-গুলিকেও এই সুযোগ দেওয়া হবে। অর্থাৎ হিডকো বা পশ্চিমবঙ্গ শিল্প নিগম এখন থেকে যথেচ্ছ পরিমাণ জমি দখল করতে পারবে। সরকারি কোম্পানীর আড়ালে আর এক শ্রেণীর জমিদার বাজারে এলো।

নয়া জমিদার - ৩

ভূমি সংস্কার আইনে জমির উর্দ্ধসীমার পরিমাণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য সংখ্যার অনুপাতে নির্ণীত হয়। সেচ সেবিত এলাকায় সর্বোচ্চ পরিমাণ ১৭.৩০ একর এবং অসেচ এলাকায় বা অন্যান্য অকৃষি জমির ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ সীমা ২৪.২১ একর। নৈর্বক্তিক প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী ইত্যাদি সর্ব্বোচ্চ ঐ ২৪.২১ একর রাখার অধিকারী। আইনের ১৪ ওয়াই ধারায় বলা আছে, কোন রায়তের দখলিকৃত জমির পরিমাণ যে কোন সময়ে উর্দ্ধসীমার অতিরিক্ত হলে, ঐ অতিরিক্ত জমি সরকারের ওপর ন্যস্ত হবে। বামফ্রন্ট সরকার ১৯৯৬ সালে আইন সংশোধন করে আগাম অনুমতি সাপেক্ষে কয়েকটি ক্ষেত্রে অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমি রাখার অনুমতি দেয়। ক্ষেত্রগুলি হলো, চা-বাগান, কারখানা, পশুখামার, পোলট্রি, দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র। ২০০০ সালে এই তালিকায় 'টাউনসিপ' বা নগরকেন্দ্র যুক্ত হয়। শর্ত ছিল, অনুমতি পাওয়ার তিন বছরের মধ্যে জমি উদ্দিষ্ট প্রয়োজনে ব্যবহৃত না হলে, উর্দ্ধসীমা আইন প্রযুক্ত হবে। (২০০৬ সালে বামফ্রন্ট সরকার

এর সঙ্গে 'শিল্প, বাণিজ্য অথবা পরিকাঠামো' শব্দগুলি জুড়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা নেয়। জমি বিক্রিরও অনুমতি দেয়। পূর্বেই আলোচনা হয়েছে, এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।)

২০১২ সালে মমতা ব্যানার্জি সরকার পুরোন সব তালিকা বাতিল করে ২২টি ক্ষেত্র নির্বাচন করেছেন, যেখানে জমি মালিকরা উর্দ্ধসীমায় ছাড় পাবেন। ক্ষেত্রগুলি হলো, কারখানা, পশুখামার, পোলট্রি, দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র, শিল্প-উদ্যান অথবা শিল্প-তালুক, অর্থ-তালুক, গুদামঘর, চা-বাগান, কৃষি-শিল্প, বিদ্যুৎ কেন্দ্র অথবা বিদ্যুৎ পরিবহন কিংবা বণ্টন সাবস্টেশন, চলচ্চিত্র নগর, ভ্রমণ-প্রকল্প, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, জৈব-প্রযুক্তি উদ্যান, খাদ্য-উদ্যান, বন্দর, বিমান-বন্দর, জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ মেরামতি এবং জাহাজ ভাঙ্গা সহ জাহাজঘাটা, তৈল ও গ্যাসীয় পদার্থের পাইপের মাধ্যমে পরিবহন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্প এবং এই শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য শিল্প, খনি ও তৎসম্পর্কিত কার্যকলাপ। এইগুলি শুধু নির্মাণের জন্য ছাড় পাওয়া যাবেনা, ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্যও যথেচ্ছ জমি রাখা যাবে। জমির মালিকদের জমি লীজ দেওয়ার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। পূর্বের মতোই শর্ত একটাই, তিন বছরের মধ্যে জমিটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে। উন্নয়নের ইজারা নিয়েছে কর্পোরেট পুঁজি। তাই তাদের খিদে মেটাতে নয়া তালুকদারি সৃষ্টি। এই কর্পোরেট তালুকদাররাই মমতা সরকারের শিল্প বন্ধু।

সরকারি জমি নয়া জমিদারদের নৈবেদ্য

১৪জেড একটি অত্যন্ত বিতর্কিত ধারা। বামফ্রন্ট সরকার এই ধারা সংশোধন করে, সরকারের নিজস্ব জমি, বিশেষত শিল্প-কারখানার জমি, বেসরকারিকরণের ব্যবস্থা করেছিল। আইনে বলা হয়েছিল, সরকার নিলামে জমি বিক্রি করবে এবং জমি বিক্রির টাকা সংশ্লিষ্ট কারখানাটির পুনরুজ্জীবন, কর্মীদের বকেয়া পাওনা মেটানো ইত্যাদি প্রয়োজনে ব্যয়িত হবে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই জমিগুলি নিলামে বিক্রি হয়নি এবং বলা বাহুল্য কারখানা তথা শ্রমিকদের অবস্থারও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। হিন্দমোটর, বাটা সহ অনেক কোম্পানীকে বামফ্রন্ট সরকার যৎকিঞ্চিত অর্থমূল্যে শত শত একর জমি হস্তান্তর করেছিল। সরকারের কোষাগারে টাকা না আসলেও, এই জমিগুলি বিক্রি করে কোম্পানী মালিকেরা কয়েক শত কোটি টাকা মুনাফা করেছে। হিন্দমোটরের বিষয়টি নিয়ে বর্তমান সরকার তদন্তও শুরু করেছে। এতদসত্ত্বেও আইনের বিতর্কিত অংশ বাতিল না করে, মমতা ব্যানার্জি সরকার বর্তমান সংশোধনীর মাধ্যমে বেসরকারিকরণের অধিক্ষেত্র আরও প্রসারিত করলো। বলা হলো, ১৪ ওয়াই আইনে পূর্বোক্ত যে সকল ক্ষেত্রে উর্দ্ধসীমার ছাড় দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে একমাত্র চা-বাগান ব্যতীত সর্বক্ষেত্রে সরকারি জমি নিলাম করে হস্তান্তর করা যাবে। অর্থাৎ সমস্ত সরকারি জমি কর্পোরেট জমিদারদের নৈবেদ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইল।

প্রোমটার তোষণ

তৃণমূল দল প্রচার করছে, আইনে টাউনসিপের ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয়নি। ফলে প্রোমটারিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। এরা যেটা চেপে যাচ্ছে, সেটা হলো বামফ্রন্ট সরকার আগেই ১৪জেড (২) ধারা সংশোধন করে টাউনসিপ প্রোমটারদের উর্দ্ধসীমায় ছাড় দিয়ে রেখেছিল। বর্তমান সরকার সেখানে হাত দেয়নি।

আবার বেদিক ভিলেজ?

এই সংশোধনীর নীট ফল হলো, ১) কৃষি জমির যথেচ্ছ ধ্বংসে আর কোন বাধা রইল না, ২) সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানীগুলির যথেচ্ছ পরিমাণ জমি দখলে স্বীকৃতি দেওয়া হলো, ৩) বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে সব ক্ষেত্রে জমি দখলের উর্দ্ধসীমায় ছাড় দেওয়া হয়েছিল, বর্তমান তৃণমূল সরকার তা' সম্প্রসারিত করলো, ৪) সরকারি জমি বেসরকারি সংস্থাকে হস্তান্তর করার বিষয়টি আরও প্রসারিত হলো। এক কথায় জমি লুঠের বন্দোবস্ত আরো পাকা হলো।

ক্ষমতায় আসার জন্য তৃণমূল নেত্রীকে তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে কয়েকটি ঘোষণা করতে হয়েছিল। যেমন, 'তৃণমূল কংগ্রেস অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি বলপূর্বক দখল করায় বিশ্বাস করে না', 'কোনওরকম শিল্প স্থাপনের জন্য কৃষিজমি দখল করা উচিত নয়', 'কোন জমিই-জমির মালিক বা কৃষকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জমি অধিগ্রহণ নয়', 'তৃণমূল সরকার অবশ্যই শিল্পায়নের জন্য সেই সকল জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা করবে যেগুলি আদৌ চাষযোগ্য নয় এবং তার জন্য তৈরী করবে পূর্ণাঙ্গ 'ল্যান্ড ব্যাঙ্ক'' ইত্যাদি ইত্যাদি। শব্দগুলি খেয়াল করা দরকার। প্রথম দুই ঘোষণায় 'দখল' এবং শেষের দুটিতে 'অধিগ্রহণ' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। জমির উপর দখলদারি বহু শতাব্দীর প্রাচীন ঐতিহ্য। দখল যার, জমি তার। এক সময়ে, লাঠি-বন্দুকের জোরে দখলদারি সাব্যস্ত হতো। অধুনা লাঠি-বন্দুকের ব্যবহার যে একেবারে উঠে গেছে, তা' নয়, তবে কেনাবেচার মাধ্যমে দখলটাই রীতিসিদ্ধ। ''বাবু বলিলেন, বুঝেছ উপেন এ জমি লইব কিনে''। বাবুরা চাইলে উপেনদের জমি দিতেই হবে। সুতরাং 'কেনা'-টা যে সর্বক্ষেত্রে সম্মতির লক্ষণ নয়, 'বলপূর্বক' দখল, এ বিষয়টা বিশ্বকবিও বিশ্বাস করতেন। বামফ্রন্ট সরকার ১৪ ওয়াই ধারায় 'বেদিক ভিলেজের' মালিকদের আই-টি তালুক নির্মাণের জন্য দেড় হাজার একরের বেশি জমি দখলের অনুমতি দিয়েছিল। বেদিক ভিলেজের মালিকরা তো কেনাবেচা করেই জমির দখল নিচ্ছিল। তাহলে আগুন জ্বলল কেন? তৃণমূলী সংশোধনী নতুন করে আগুন জ্বালাবে না, এ কথা কী হলফ করে বলা যায়?

আধুনিক জমি অর্থনীতি

জমির অর্থনীতিটাই পাল্টে গেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চাহিদা জমির মুক্ত বাজার। অর্থাৎ বাজারে খোলামেলা হাতবদল করতে বা বাজারের চাহিদা অনুসারে জমির চরিত্র বদল করার ক্ষেত্রে

কোন বাধানিষেধ যেন না থাকে। এশিয়া-আফ্রিকার গরীব দেশগুলিতে জমি লুঠের মহোৎসব শুরু হয়েছে। সবই বিশ্ব ব্যাঙ্কের মদতে। ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে, যেখানে ভূমি সংস্কারের আইনকানুনগুলো এখনও চালু আছে, সেখানে জমি হাতাতে কিছু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। সর্বপ্রধান বাধাগুলি হলো জমির উর্দ্ধসীমা বা সিলিং আইন, আদিবাসীদের জমি সাধারণ সম্প্রদায়কে হস্তান্তরে বাধা, কৃষিজমি-জলাভূমির চরিত্র বদলের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ। এ ছাড়া অরণ্যভূমি সংরক্ষণ ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের আইনগুলোও জমির পণ্য-চরিত্রের পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তির পক্ষে বাধাস্বরূপ বলে মনে করা হয়।

এই বাধাগুলি নির্মূল করার লক্ষ্যে কর্পোরেট পুঁজি উঠে পড়ে লেগেছে এবং জমি হাতানোর বেশ কয়েকটি মডেল তারা হাজির করেছে। সব থেকে পছন্দের মডেল অবশ্যই সরকারের মাধ্যমে 'অধিগ্রহণ'। পুঁজি এবং ঝুঁকি, দুটোই কম। সরকার যদি অধিগ্রহণ করে না দিত, হাজার হাজার একরের 'সেজ' প্রকল্পগুলি হয়তো অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতো।

আর একটি মডেল হলো জমি লীজ নেওয়া। লীজ নেওয়ার পদ্ধতি সরলীকরণের জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কও সুপারিশ করেছে। আমাদের দেশে কিছু জমি আছে, ঐতিহ্য পরম্পরায় যেগুলির উপর সাধারণ মানুষের গোষ্ঠীগত বা কৌম অধিকার স্বীকৃত। জলাশয়, নদী-খাল-বিল, বনভূমি, গোচারণ ভূমি, তটভূমি, পতিত জমি ইত্যাদি নানাবিধ প্রাকৃতিক সম্পদ সাধারণ মানুষ তাদের যৌথ প্রয়োজনে ব্যবহার করে। গরীব মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় এইসব প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রকার জমির মালিকানা সরকারের। জমির উপর যাদের দীর্ঘদিনের অধিকার, সেই সকল প্রান্তিক মানুষদেরই এই সমস্ত জমির পাট্টা অথবা লীজ পাওয়ার কথা। কিন্তু বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এই জমিগুলি সরকারের থেকে লীজ নিয়ে দখল কায়েম করছে। বিপন্ন হচ্ছে এই সমস্ত জমির উপর নির্ভরশীল মানুষ। শালবনিতে যে ৪০০০ একর জমি সরকার জিন্দালদের নামমাত্র মূল্যে লীজ দিয়েছে, তার একটা বড়ো অংশ ছিল আদতে 'জঙ্গল'। বামফ্রন্ট সরকার জিন্দালদের লীজ দেওয়ার জন্য নানা ছলে 'অরণ্য সংরক্ষণ আইন' উপেক্ষা করেছে। তৃণমূলী শাসনে নয়াচরে ১২ হাজার একর জমি একটি কোম্পানীকে লীজ দেওয়া হলো। পরিবেশ আইন, কোস্টাল রেগুলেটরি বিধি— কোন কিছুরই তোয়াক্কা করা হলো না। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আদিবাসীদের বঞ্চিত করে তাদের প্রাপ্য জমি ব্যবসায়ী-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে লীজ দেওয়া হয়েছে, হচ্ছে। আইন অসহায়।

ব্যক্তিগত জমিও লীজ নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। কোথাও কন্ট্রাক্ট ফার্মিং চলছে, কোথাও চা-বাগান, কোথাও ইট ভাঁটা, কোথাও হোটেল-রিসর্ট, কোথাও আরও অনেক কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে অন্যের জমি লীজে নিয়ে। এই সব প্রক্রিয়ার বৈধতা প্রাপ্তির দাবীতে বিনিয়োগকারীরা সরব। খাদ্য অর্থনীতির থেকে প্রাধান্য পাচ্ছে বাণিজ্য অর্থনীতি। নয়া অর্থনীতির তাগিদে তাই ভূমি সংস্কার আইনের আগলও আলগা হচ্ছে।

কৌশলী মমতা

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলন থেকে মমতা ব্যানার্জির ক্ষমতায় উত্থান। আপাতত অধিগ্রহণের বিরোধিতা করা ছাড়া তাঁর উপায় নেই। তবে এখনও পর্যন্ত বেসরকারি কোম্পানীর জন্য অধিগ্রহণে তাঁর সম্মতি অমিল হলেও সম্পূর্ণ বিরোধিতার পথ পরিত্যাগ করে তিনি নির্দ্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে অধিগ্রহণে সায় দিচ্ছেন। 'সেজ' আইনের প্রয়োগ হবেনা বলে তিনি বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু 'ইনফোসিসের' দাপটে সেখানেও তিনি আপোস করতে এগিয়ে এসেছেন। 'সেজ' নামটি তিনি ব্যবহার করবেন না, কিন্তু অন্য কোন নামের আড়ালে, (যেমন 'ইন্ডাসট্রিয়াল পার্ক') যদি 'সেজ'-এর সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায়, তাহলে তাঁর আপত্তি নেই। 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'-র পুরোন বাংলা প্রবাদটা মনে পড়িয়ে দেয়। মুখ্যমন্ত্রী ভালো করেই জানেন, কর্পোরেট জগৎ তিনটি বিষয়ে তাঁর অবস্থান মেনে নিতে পারেনি— অধিগ্রহণ বিরোধী অবস্থান, 'সেজ' বিরোধী অবস্থান এবং রিটেইল ব্যবসায় বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ বিরোধী অবস্থান। এ রাজ্যের সর্ববৃহৎ মিডিয়া-হাউস তাদের মুদ্রণ এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর এই অবস্থানের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে যে উষ্মা প্রকাশ করে গেছে, তা থেকেই কর্পোরেট দুনিয়ার মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হয়না। ভূমি সংস্কার আইনের আলোচ্য সংশোধনীটি গৃহীত হওয়ার পরে, সংবাদপত্রটির সম্পাদকীয় শিরোনাম দেওয়া হলো "হাঁটি হাঁটি"। অর্থাৎ সরকার এক পা এক পা করে তাদের অভীষ্ট পথে যাত্রা শুরু করেছে। তারা আনন্দিত, কিন্তু উল্লসিত নয়। 'মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপ অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য। ইহা জরুরি পদক্ষেপ। কিন্তু যথেষ্ট নয়। জমির সমস্যাটিকে তিনি যখন স্বীকারই করিয়াছেন, তখন তাহার আমূল সমাধান বিধেয় ছিল। তাহার উপায়, জমির উর্দ্ধসীমা সংক্রান্ত আইনের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন।... মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে রাজনীতির সওয়ার, তাহা হয়তো তাঁহাকে অধিগ্রহণের প্রয়োজন মানিতে দিবে না, অন্তত আপাতত। কিন্তু সেই কারণেই তাঁহার কর্তব্য, জমির বাজারটিকে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া।'[৩]

মা ভৈঃ। কর্পোরেট মিডিয়া-নির্দেশিত কর্তব্যই মমতা সরকার পালন করছেন। ভোটের ময়দানে মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল সিপিএম-এর প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু বাজার অর্থনীতির রূপায়নে তাঁরা ভাই ভাই। এতে কোন ভুল নাই।

১. Econmic Review, Govt of West Bengal, 2011-12
২. Structural Retrogression and Rise of 'New Landlords' in Indian Agriculture- R Vijay- EPW, 4 Feb 2012
৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, সম্পাদকীয়, এপ্রিল ৪, ২০১২

শতবর্ষে স্মরণ

ডাঃ বিজয় কুমার বসু : জন্মশতবর্ষে ফিরে দেখা

দীপংকর চক্রবর্তী

ডাঃ বিজয়কুমার বসুর কথা মনে হলেই একটা পুরোনো দুঃখের স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে। প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা। ১৯৮৪ নাগাদ আমাদের পত্রিকা *অনীক*-এর কুড়ি বছর পূর্ণ হলো। তখনকার পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সমর সেন, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ডাঃ বিজয়কুমার বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী প্রভৃতি। আর পাঁচ বছর পরেই *অনীক*-এর পঁচিশ বছর পূর্ণ হবে, এবং তা নিয়ে তখন থেকেই আমরা একটা পরিকল্পনা করতে শুরু করেছিলাম। পরিকল্পনাটা ছিল : এঁদের পাঁচজনকে প্রধান ভূমিকায় রেখে কলকাতায় ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট বা অন্য কোনো বড়ো হলে বক্তৃতা, আলোচনা, গান, নাটক ইত্যাদির দারুণ একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবো। মানসিকভাবে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ ১৯৮৫ সালেই বীরেনদা মারা গেলেন; '৮৬-তে ডাঃ বসু; '৮৭-তে প্রথমে সমরবাবু, তারপর হেমাঙ্গদা।বাকি রইলেন শুধু মহাশ্বেতাদি। আমাদের মন ভেঙে গেল। শেষ পর্যন্ত সেই অনুষ্ঠান আমরা আর করি নি।

ঘটনাটার কথা বললাম ডাঃ বসু-সহ উপরোক্তদের আমরা কী চোখে দেখতাম তা বোঝাবার জন্য। কারণ, আমরা জানি, ভারত ও চীন— এই দু'টি দেশের নিবিড় বন্ধুত্বের ইতিহাস অনেক দিনের, এবং আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে সেই মৈত্রীর ক্ষেত্রে যে গৌরবময় এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছিল, তাতে সক্রিয় ভূমিকা ছিল ডাঃ বসুর। ১৯৩০-এর দশকে জাপানি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন চীনা জনগণ, তাঁদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাঁদের প্রতিরোধ যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য একটি মেডিক্যাল মিশন প্রেরিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে। উদ্যোগ নিয়েছিলেন ভারতীয় জনগণের পক্ষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতিরা। সেই মেডিক্যাল মিশনেরই অন্যতম সদস্য ছিলেন ডাঃ বিজয়কুমার বসু। ১৯৪৩ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে তিনি সংগ্রামী চীনা জনগণের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ভারত-চীন মৈত্রীর সেতু হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে গেছেন।

যে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার সেটা হচ্ছে এই যে, তাঁর এই ভূমিকা নিরাপদ কোনো সভাকক্ষে বা বক্তৃতামঞ্চে অর্জিত হয়নি— অর্জিত হয়েছিল জাপানের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ লড়াইয়ে রত চীনের বিপদসঙ্কুল মুক্তাঞ্চলে, গেরিলা ঘাঁটিতে ও পাহাড়ে— চীন বিপ্লবের তৎকালীন মূল কেন্দ্র ইয়েনানের গুহায়। স্বভাবতই চীন বিপ্লবের বিজয় অর্জনের পর সেদেশের নেতৃবৃন্দ ভারত-চীন সংগ্রামী মৈত্রীর এই জীবন্ত প্রতীককে— সেই চল্লিশের দশকে ইয়েনানে চীন বিপ্লবের বিদেশী বন্ধুদের নিয়ে গঠিত 'প্রাচ্য জাতিসমূহের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংঘ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাকে— বিস্মৃত হন নি, তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বার বার তিনি চীনে গেছেন, দু দেশের মধ্যে মৈত্রীর সেতুবন্ধনের কাজে ব্যাপৃত থেকেছেন।

এ প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যও জানানো দরকার। ১৯৪৩ সালে ডাঃ বসু যখন দেশে ফেরেন, তখন তাঁর হাতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে মাও সেতুং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশিকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠিয়ে সে সময় সিপিআই ভারতে "ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করার এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের উভয় লক্ষ্যই অর্জন" করতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ভারতে বসে সিপিআই নেতৃত্ব সেই দ্বিবিধ লক্ষ্যের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সম্পূর্ণ একপেশেভাবে শুধুমাত্র ফ্যাসিবাদের বিরোধিতার লক্ষ্যটির ওপরেই গুরুত্ব দেন, এবং ফলত ভারতীয় গণমানসে সঠিকভাবেই তাদের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব জোরদার হয়ে ওঠে। (উল্লেখ্য যে, সে সময় যে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বের দোহাই দিয়ে ভারতীয় নেতৃত্ব ওই ন্যক্কারজনক অবস্থান নিয়েছিল, সেই সোভিয়েতের নেতা স্তালিনও ১৯৪৯ সালে মস্কোতে সমাগত ভারতীয় পার্টি-প্রতিনিধি দলকে আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।)

উল্লেখ্য যে, চীনে থাকাকালীন ডাঃ বসু চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পেয়েছিলেন। ১৯৪০-এর দশকে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদও পেয়েছিলেন। ১৯৬২-তে ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধের পর ভারত-চীন মৈত্রী সমিতির তৎকালীন অনেক সামনের সারির নেতাও যখন উগ্র জাতীয়বাদের জোয়ারে গা ভাসিয়ে সমাজতান্ত্রিক চীনের বিরুদ্ধে কুৎসিত প্রচারে মত্ত হয়েছেন, তিনি সেই অশুভ জোয়ারে কোনোদিন গা ভাসান নি। তাই ১৯৬২-পরবর্তীকালে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় আমরা যখন প্রথম নতুন করে ১৯৭৪ সালে জেলা স্তরে ভারত-চীন মৈত্রী সমিতি গড়ে তুলেছি, তখন তার সবচেয়ে সোৎসাহ সমর্থন এসেছে তাঁর কাছ থেকে। ওই জেলা কমিটির প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণেও তিনি কোনো দ্বিধা দেখান নি। সে বছর ২৪ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত সমিতির প্রকাশ্য

জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রেখেছেন। জরুরি অবস্থার পর ৮ জানুয়ারি ১৯৭৮-এর বহরমপুরে অনুষ্ঠিত সমিতির প্রথম সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনেও তিনিই ছিলেন প্রধান বক্তা। এর পরে রাষ্ট্রীয় স্তরে ভারত-চীন সম্পর্ক স্বাভাবিক হবার পরে সর্বভারতীয় স্তরে আবার ভারত-চীন মৈত্রী সমিতি গড়ে তোলার প্রাথমিক সাংগঠনিক স্তরে স্বাভাবিকভাবেই তিনিই ছিলেন সভাপতি। কিন্তু পরবর্তীকালে দলবাজী, গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী সুবিধেবাদীদের চক্রান্তে তিনি সেখান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাতে তাঁর কোনো মর্যাদা হানি হয়নি, বরং ভারত-চীন মৈত্রী সমিতিই ক্রমশ নিষ্ক্রিয় ও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য যে, সেই চক্রান্তের প্রতিবাদে সমিতির সর্বভারতীয় যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত আমি এবং আরও কয়েকজন সদস্যও সেই কমিটির সাথে সম্পর্ক ছেদ করেছিলাম।

চীনে প্রেরিত পূর্বোক্ত মেডিক্যাল মিশনে ডাঃ বসুর অন্যতম সহযাত্রী ডাঃ কোটনিস, ডাঃ বসুর মতো চীনা জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সেদেশেই থেকে যান। খুব অল্প বয়সেই সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। ডাঃ বসু তখনও চীনেই ছিলেন। ভারত-চীন সংগ্রামী মৈত্রীর এই অমর প্রতীকের স্মৃতিতে ডাঃ বসুর নেতৃত্বেই গড়ে উঠেছিল সর্বভারতীয় ডাঃ কোটনিস স্মৃতি সমিতি। তাছাড়া চীনের প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যা আকুপাংচারকেও ভারতে প্রচলিত ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তিনি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন, উৎসাহীদের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করেছেন, এবং গড়ে তুলেছেন সর্বভারতীয় আকুপাংচার সোসাইটি।

মাও সেতুঙের নেতৃত্বাধীন যে বিপ্লবী চীনের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের সংগ্রামী মৈত্রীর যোগসূত্র রচনা করেছিলেন ডাঃ বসু, তাঁর জীবদ্দশাতেই মাও-এর মৃত্যু-পরবর্তীকালে সেই চীনেও বিরাট সব পরিবর্তন এসেছে, মাও চিন্তাধারা ও শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে চীন। এ নিয়ে প্রকাশ্যে তিনি সোচ্চার ও সমালোচনা মুখর না হলেও, অন্তত জীবনের শেষ দু'-তিন বছর ধরে তাঁর মনেও জেগেছে অনেক প্রশ্ন ও সংশয়— ঘনিষ্ঠ আলাপে বহু সময়েই তা ধরা পড়েছে।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৭৩-এ। তার আগেই অবশ্য তাঁর সম্পর্কে কিছুটা জানতাম ডাঃ কোটনিসের উপর খাজা আহমদ আব্বাসের লেখা '*ফেরে নাই শুধু একজন*' পড়ে (যদিও পরে বুঝেছি, সেই বইটিতে অনেক তথ্য-বিকৃতি ছিল)। ১৯৫৯-এ আমরা যখন ছাত্র, তখনই চীনের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে ভারত সরকার গন্ডগোল পাকাতে শুরু করেছে, যার পরিণতি ১৯৬২-তে ভারতের চীনযুদ্ধ। এভাবে সেই পঞ্চাশের দশক থেকে ভারত-চীন মৈত্রীর যে সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল— জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার অসীম ভূমিকা ছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানিতে এবং ভারত সরকারের সম্প্রসারণবাদী নীতির ফলে তার অকালমৃত্যু হলো। তার এক দশক পরে ১৯৭৩ সালে ভারত সরকার ডাঃ বসুকে চীন সরকারের আমন্ত্রণে চীনে যাবার অনুমতি দিল। তিনি দেশে ফেরার পরে পরেই আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর চীন ভ্রমণ নিয়ে একটা সাক্ষাৎকার দেবার অনুরোধ জানালাম। তিনি সম্মতি জানালেন, আমরাও একদিন গিয়ে হাজির হলাম তাঁর বাড়িতে (এখন যেখানে তাঁর নামের সরকারি আকুপাংচার হাসপাতাল)। সেদিন, এবং পরে আর একদিন গিয়ে মোট দু'টো সাক্ষাৎকার আমরা নিয়েছিলাম। একটা ছিল মূলত সমাজতান্ত্রিক চীনের তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে, আর একটা ভারত-চীন মৈত্রীর অতীত ও বর্তমান নিয়ে। প্রথমটি ছাপা হয়েছিল আমাদেরই পাক্ষিক পত্রিকা *পূর্ব তরঙ্গ*-এ, দ্বিতীয়টি *অনীক*-এ। (এই সংখ্যাতেই *অনীক*-এ প্রকাশিত লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে)। কাজেই সে সম্পর্কে আর নতুন করে কিছু বলার দরকার নেই। বরং তাঁর কথাই একটু বলি।

আগেই বলেছি, আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলায় ভারত-চীন মৈত্রী সমিতি গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি। সেই সূত্রেই তাঁর সাথে বিশেষ ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। প্রতি মাসে যখন *অনীক*-এর কাজে কলকাতা আসতাম বহরমপুর থেকে, তখন আমার অন্যতম কর্মসূচিই হতো তাঁর সাথে দেখা করা। দু'-এক বার দেখা করতে না পারলে পরে তা নিয়ে অনুযোগ জানিয়েছেন। বেশ মনে পড়ছে, একবার তাঁর বাড়িতে আমি ও আরও কয়েকজন বসে কথা বলছি, আর বার বার ঘাড়ের যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করছি। সেটা লক্ষ করে তিনি কী হয়েছে জানতে চাইলেন। আসলে আমার ঘাড়ে স্পন্ডিলাইটিস হয়েছিল, অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগ সারছিল না। সেকথা তাঁকে বলতেই চটে গেলেন ভীষণ, বললেন: আপনি ভারত-চীন মৈত্রী আন্দোলনের নেতা, আর জানেন না যে চীনের প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যা আকুপাংচারে স্পন্ডিলাইটিস সেরে যায়! বলেই পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা বেতের ইজিচেয়ারে শুইয়ে দিলেন, এবং গোটা কয়েক সূঁচ ঢুকিয়ে দিলেন শরীরের বিভিন্ন জায়গায়। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমার যন্ত্রণা কমে গেল। তারপর তিনি আমার আকুপাংচার চিকিৎসা শুরু করলেন তাঁর চেম্বারে। সেজন্য প্রথম দিকে সপ্তাহে দু'দিন ও পরে একদিন করে আসতে হতো। তিন মাস চিকিৎসার পরই আমার ঘাড়ে স্পন্ডিলাইটিস সেরে গেল (অনেক পরে আর একবার স্পন্ডিলাইটিস হয়েছিল, এবার কোমরে। তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র ডাঃ গাঁতাইতের আকুপাংচার চিকিৎসায় সেটাও সেরে যায়।

তাঁর সম্পর্কে আর একটা কথাও বলা দরকার। আমরা সেই ১৯৭০ থেকে বহরমপুরে একটা ছোট্ট প্রকাশনী গড়ে তুলেছিলাম 'পিপলস্ বুক এজেন্সি' নামে। মূলত চীনের বই, বিশেষত

এর পর ৩৯ পৃষ্ঠায়

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

ভারত-চীন মৈত্রী

ডা. বিজয় বসু

[ভারত ও চীন— এই দু'টি দেশের নিবিড় বন্ধুত্বের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। এই বন্ধুত্বের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় রচিত হয়েছিল আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে— ১৯৩৮ সালে। জাপ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চীনা জনগণ সেদিন যে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে সেবাকার্যের জন্য একটি মেডিক্যাল মিশন সেদিন প্রেরিত হয়েছিল ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে। সেই মেডিকেল মিশনের অন্যতম সদস্য ডা. বিজয় বসু, যিনি সবচেয়ে বেশিদিন চীনে সেবাকার্যে নিয়োজিত ছিলেন এবং যিনি সম্প্রতি আবার চতুর্থবারের জন্য চীন ঘুরে এলেন, 'অনীক'-এর বিশেষ প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সেদিনের সেই গৌরবময় অধ্যায়ের এক অন্তরঙ্গ বিবরণ তুলে ধরেছিলেন। সেই বিবরণীটাই আমরা, ডা. বিজয় বসুর অনুমতিক্রমে 'অনীক'-এর পাঠকদের উপহার দিচ্ছি]

১৯৩৮ সাল। ইউরোপের আকাশে দেখা দিয়েছে মহাযুদ্ধের কালো ছায়া। এশিয়াতেও তখন অভিনয় শুরু হয়েছে এক নতুন নাটকের। সাম্রাজ্যবাদী জাপান গ্রাস করতে শুরু করেছে দুর্বল চীনকে। জাপ সাম্রাজ্যবাদ এই আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে চীনের জনগণ শুরু করেছেন ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ-যুদ্ধ। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনতা এগিয়ে এসেছেন চীনের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানাবার জন্য। ভারতীয় জনগণও স্বভাবতই হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা ভারত-চীনা জনগণের এই সাম্রাজ্যবাদ-চীন মৈত্রীর মহান ঐহিত্য অনুসরণ করে চীনা জনগণের এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জীবন-মরণ সংগ্রামে নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে বসে থাকতে চাইলেন না। কিন্তু ভারতও তো সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক পদানত একটি দেশ। চীনের সমর্থনে ভারতীয় জনগণ কী করতে পারেন? এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ১৯৩৭ সালের শেষে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো যে, জাপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থনের প্রতীক হিসাবে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত চীনে সেবাকার্য চালাবার জন্য ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে একটি মেডিক্যাল মিশন পাঠানো হবে।

কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সাহায্যের জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানানো হলো। সাড়া পাওয়া গেল বিপুলভাবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানুষের দান এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ওষুধ ও যন্ত্রপাতি নিয়ে বেশ ভালোরকম এক সাহায্য ভাণ্ডার গড়ে উঠলো। চিকিৎসক দলে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক মেডিক্যাল মিশন নির্বাচিত হলো। এর নেতা নির্বাচিত হলেন ডঃ অটল। এর আগে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়ে তিনি সেখানকার গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি ভারতের শুভেচ্ছা ও প্রীতির বাণী বহন করে নিয়ে যান, 'আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে' যোগদান করেন, এবং যুদ্ধে অহতদের সেবা করার অভিজ্ঞতা অর্জন করে আসেন। নাগপুরের ষাটবছর বয়স্ক ডঃ চোলকার নির্বাচিত হলেন সহ-নেতা। তাছাড়াও এই মিশনের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হলেন শোলাপুরের ডঃ দ্বারকানাথ শান্তরাম কোটনিস, কলকাতার ডঃ দেবেশ মুখার্জী এবং আমি। আমাদের তিনজনের বয়সই তখন তিরিশের নীচে।

মেডিক্যাল মিশনের চীনযাত্রার পূর্বমুহূর্তে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে অনুষ্ঠিত জনসভায় আমাদের বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হলো। হাওড়া স্টেশনের আমাদের বিদায় জানালেন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু এবং বিপুল জনতা। বোম্বাইতেও সরোজিনী নাইডুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আমাদের বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হলো। যাত্রার শুরুতেই অবশ্য একটা বিঘ্ন উপস্থিত হলো। ফ্যাসিবাদী ইতালী সরকার তখন ছিল জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই যে ইতালীয় জাহাজে আমাদের যাবার কথা ছিল, তার কর্তৃপক্ষ যাত্রী হিসেবে আমাদের নিয়ে যেতে রাজী হলেও, জাপানের বিরুদ্ধে চীনরে সেবায় নিয়োজিত হবে ব'লে আমাদের সঙ্গের ওষুধপত্র ইত্যাদি নিতে অস্বীকার করলো। অবশেষে বৃটিশ জাহাজ 'রাজপুতনা' ওষুধপত্র-সহ আমাদের নিয়ে যেতে রাজী হলো। ১৯৩৮ সালের পয়লা সেপ্টেম্বরে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের সঙ্গে গেল একট অ্যাম্বুলেন্স ট্রাক, একটি অ্যাম্বুল্যান্স কার, ষাট বাক্স ওষুধ ও অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি— এবং সমগ্র ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

জাহাজের যাত্রীরা আমাদের গন্তব্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁরা বিভিন্নভাবে আমাদের উৎসাহ দিলেন ও সাহায্য করলেন। আধুনিক চীন, বিশেষত মাও সেতুঙের নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও অষ্টম রুট আর্মি (লাল ফৌজের তৎকীন নাম) সম্পর্কে মার্কিন সাংবাদিক অ্যাগ্নেস স্মেড্‌লি ও এডগার স্নো'র সদ্যপ্রকাশিত বিভিন্ন রচনা আমরা কয়েকজন আগেই পড়েছিলাম। মিশনের অন্য সদস্যরা জাহাজে বসে সেগুলো পড়ে ফেললেন এবং বিশেষ অনুপ্রাণিত বোধ করতে লাগলেন। এডগার স্নো'র 'রেড স্টার ওভার চানয়া' পড়ে বৃদ্ধ ডঃ চোলকার এতো বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন যে, তিনি ঘোষণা করে দিলেন— কমিউনিস্টরা যদি এরকম হয়, তবে আমিও কমিউনিস্ট! আমদের অন্যতম সহযাত্রী কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ চাও তিং-চী'র কাছে অষ্টম রুম আর্মির বীরত্বপূর্ণ সব

অভিযানের বর্ণনা শুনে আমি প্রচণ্ড অনুপ্রেরণা বোধ করলাম। ডঃ কোটনিসও এদের সম্পর্কে আন্তরিকভাবে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। হংকং যাবার পথে কলম্বো, পেনাং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি যেসব বন্দরে জাহাজ ভিড়লো, তার সব জায়গাতেই ভারতীয় ও চীনা জনতা বিপুলভাবে আমাদের সম্বর্ধনা জানালেন। হংকং-এ পৌঁছেও আমরা বিপুল সম্বর্ধনা পেলাম। হংকং থেকে আলাদা একটা জাহাজে করে আমরা চীনের মূল ভূখণ্ডের ক্যান্টনে পৌঁছালাম ১৭ই সেপ্টেম্বর। ক্যান্টন বন্দরে অন্যান্যদের সঙ্গে আমাদের স্বাগত জানাতে এলেন সুন চিং-লিন (মাদাম সান ইয়াৎ-সেন)

ক্যান্টনে আমরা এক সপ্তাহ কাটালাম। অনেকগুলি সম্বর্ধনাসভা ও ভোজসভায় আমরা যোগ দিলাম। সর্বত্রই পেলাম বিপুল সম্বর্ধনা। সর্বত্রই আমরা হৃদয় দিয়ে অনুভব করাম ভারতীয় জনগণের প্রতি চীনা জনগণের আন্তরিক মৈত্রীর অনুভূতি, জাপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য চীনা জনতার মহান দৃঢ় সংকল্প।

ক্যান্টনে দু'টি মজার ঘটনা ঘটলো। ক্যান্টনের মেয়র কর্তৃক প্রদত্ত ভোজসভায় মাদাম সুন চিং-লিন খেয়াল করলেন, চীনাদের মতো দু'টো কাঠিতে খেতে অনভ্যস্ত আমরা বিশেষ বিব্রত বোধ করছি। তিনি তাই দেখে হঠাৎ নিজের কাঠি সরিয়ে রেখে দিয়ে খেতে শুরু করলেন এবং সবাইকে শুনিয়ে বসে উঠলেন, "ভগবান আমাদের হাত দিয়েছেন খাবার জন্যেই তো—!" দেখাদেখি সবাই হাত দিয়ে খেতে শুরু করলো।

আরেকদিন, আমি, কোটনিস ও মুখার্জী একটা রেস্টুরেন্ট-এ খেতে ঢুকেছি। কিন্তু পরিবেশনকারী মেয়েটি একেবারেই ইংরাজী জানেন না, আমরাও চীনাভাষা জানি না। তাই আমরা মুরগী খেতে চাই— এটা বোঝাবার জন্য খাদ্যতালিকার উল্টো দিকে আমরা সযত্নে মুরগীর একটা ছবি এঁকে দেখালাম। ছবিটা এতোই নিখুঁত হয়েছিল যে, মেয়েটি ছুটে গিয়ে তক্ষুণি আমাদের জন্য তিন প্লেট ব্যাংভাজা এনে হাজির করলো!

ক্যান্টনে মাদাম সুনের কাছে আমরা অনুরোধ জানালাম যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে, সেখানে আমাদের পাঠাবার জন্য। তিনি আমাদের উপদেশ দিলেন— কমিউনিস্টদের অষ্টম রুট বাহিনীর এলাকায় চলে যেতে। যাই হোক, ২৩শে সেপ্টেম্বর আমরা অ্যাম্বুল্যান্স ট্রাকে করে চ্যাংশার দিকে যাত্রা করলাম। ২৫শে সেপ্টেম্বর সেখানে পৌঁছেই আমরা কাজে লেগে গেলাম। অবশ্য সম্বর্ধনা, ভোজসভা ইত্যাদি কিছুই বাদ গেল না। চীনের রেডক্রশের প্রধান ড. রবার্ট লিম-এর অধীনে আমরা কাজ শুরু করলাম। কয়েকদিন পরে আমরা পৌঁছোলাম চীনের যুদ্ধকালীন রাজধানী হ্যাংকৌতে। উহান ফ্রন্টে যুদ্ধক্ষেত্রের এক হাসপাতালে দিন দশেক কাজ করলাম আমরা। কুয়োমিন্টাং এলাকায় এই দশটি দিনই শুধু আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

প্রথমে চ্যাংশায় এবং পরের হাংকৌতে জাপ সাম্রাজ্যবাদের বর্বর আক্রমণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটলো। দিনের পর দিন বিমান থেকে বোমাবর্ষণের মধ্যেই আমাদের কাজ চালাতে হলো— ট্রেঞ্চের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে চিকিৎসা করার অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করলাম। সেসময় চীনের মোট দশ হাজার ডাক্তারের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিল মাত্র হাজার দুয়েক এবং তাদের মধ্যে এক হাজার ডাক্তার যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে, গড়ে প্রতি দু'হাজার সৈন্যপিছু মাত্র একজন করে ডাক্তার ছিলেন। স্বভাবতই এই ভয়াবহ অবস্থাটা আমাদেরকে নাড়া দিল— যথাসাধ্য সেবাকার্য আমরা চালিয়ে গেলাম। চিকিৎসার সময় আহত চীনা সৈন্যদের চোখেমুখে যে দৃঢ়তা এবং ভারতীয় জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা ও প্রীতির বাণী ভেসে উঠতো, তাতে আমাদের মনোবল বেড়ে যেত, ভারত ও চীন এই দুই দেশের মহান মৈত্রীর সম্পর্কই আরও দৃঢ়তর হয়ে উঠতো।

হ্যাংকৌতে আমরা পরিচিত হলাম প্রগতিশীল মার্কিন সাংবাদিক ম্যাদাম অ্যাগ্নেস স্মেড্‌লির সঙ্গে। যতোদিন আমরা সেখানে ছিলাম, ততোদিন তিনি গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের দেখাশুনা করেছেন। তাঁর মুখেই আমরা শুনলাম প্রতিরোধ-যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্টদের তথা অষ্টম রুট আর্মির গৌরবোজ্জ্বল ও বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের বিস্তৃত কাহিনী। আমরা চঞ্চল হয়ে উঠলাম কমিউনিস্টদের এলাকায়, তাদের মূলে ঘাঁটি ইয়েনানে যাবার জন্য। স্মেড্‌লি অষ্টম রুট আর্মির আমাদের সংযোগ রক্ষার ভার নিলেন।

তাঁর মাধ্যমেই আমরা চৌ এন-লাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাদের মনে বিশেষ ছাপ ফেললেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই আমরা অনুরোধ জানালাম— আমাদের ইয়েনানে যাবার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। তিনি আমাদের কিছুদিন ধৈর্য ধরতে বললেন, কেননা কমিউনিস্টরা তখন কুয়োমিন্টাংদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে সামিল হয়েছেন, কাজেই তাড়াহুড়ো করলে সেটা কুয়োমিন্টাংরা অন্য চোখে দেখতে পারে। পরবর্তী সাক্ষাৎকারের সময়েই তিনি জানালেন, আমাদের অনুরোধ তিনি ইয়েনানে জানিয়ে দিয়েছেন।

অল্পদিনের মধ্যে জাপানী আক্রমণকারীরা হ্যাংকৌর দিকে এগিয়ে আসতে থাকায় আমরা যে ৮৭নং হাসপাতালে কাজ করতাম, সেটাকে অনেক পশ্চিমে ইচাঙে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা হলো। ১৭ অক্টোবর আমরা ইয়াংসি নদী বেয়ে স্টিমারে চড়ে ইচাঙের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। ইচাঙে আমাদের প্রায় মাসখানেক থাকতে হলো। প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এতো দূরে বেসামরিক হাসপাতালে কাজ করতে করতে আমরা হাঁফিয়ে উঠছিলাম, মোটেই আমাদের ভালো লাগছিল না। আমরা তাই ঠিক করলাম, এটাই হচ্ছে ইয়েনানে যাবার জন্য অনুরোধ

জানাবার উপযুক্ত সময়। কাজেই আমরা গিয়ে হাজির হলাম চীনের যুদ্ধকালীন রাজধানী চুংকিঙে। বিশ্বভারতীর চীনাভাষার অধ্যাপক তান ইউয়ান-শেনের মাধ্যমে আমরা কুয়োমিন্টাঙের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী এইচ কুঙের সঙ্গে দেখা করে আমাদের ইয়েনানে পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ জানালাম। কুং আমাদের নিরুৎসাহ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। ইয়েনানের ফ্রন্টের কোনোরকম সুযোগ-সুবিধে নেই, খাবার-দাবারের খুব অভাব, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ইত্যাদি ইত্যাদি দুঃখ-কষ্টের ভয় দেখিয়ে তিনি আমাদের প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। এতেও যখন আমাদের ইয়েনানে যাবার সংকল্পকে দমিয়ে দেওয়া গেল না, তখন তিনি বললেন, ''বেশ তাহলে একটা প্লেনে আপনাদের সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি, কয়েকদিন সেখানে থেকে ঘুরে আসুন।'' কিন্তু আমরা চীনে শুধু বেড়াতে, ভোজ খেতে আর সম্বর্ধনা নিতে আসেনি, আমরা এসেছি যুদ্ধক্ষেত্রে আহত যোদ্ধাদের সেবা করতে। কাজেই আমরা এবার কুয়োমিন্টাংদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এফ.সি. ইয়েনকে ধরলাম, আমাদের ইয়েনান যাবার ব্যবস্থা করার জন্য। তিনি সহানুভূতি দেখালেও কার্যোদ্ধার করতে পারলেন না। তখন আমরা ঠিক করলাম, অষ্টম রুট আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা নিজেরাই নিজেদের অ্যাম্বুল্যান্স করে ইয়েনান যাবো। সেই ব্যবস্থাই হলো। কিন্তু মুস্কিল হলো, কুয়োমিন্টাংরা বাধ্য হয়ে যাবার অনুমতি দিলেও, পেট্রলের খুব অভাব, এই অজুহাত দেখিয়ে আমাদের গাড়ীর জন্য কোনো পেট্রল দিতে রাজী হলো না। সমস্ত পেট্রলই ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য চমৎকার একটা বুদ্ধি বের করলেন ডঃ অটল। তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কাছে এক তারাবার্তা পাঠিয়ে জানালেন— আমাদের পেট্রলের খুব অভাব, শিগ্‌গিরি পেট্রল কিনবার টাকা পাঠান।'' স্বভাবতই এই তারবার্তার খবর কুঙের কানেও পৌঁছোলো, এবং নিজেদের মুখরক্ষার জন্য তিনি দ্রুত পেট্রলের ব্যবস্থা করে দিলেন।

অবশেষে জানুয়ারী মাসে আমরা আমাদের অ্যাম্বুল্যান্স করে চড়ে ইয়েনানের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। আমরা সঙ্গী হিসেবে পেলাম রিউই অ্যালিকে। নিউজিল্যান্ডের অধিবাসী রিউই চীনেই থাকতেন। 'চীনা শিল্প-সমবায়' আন্দোলনের সম্পাদক হিসেবে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং এই কাজের সূত্রে কুয়োমিন্টাং ও কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ জানাশুনা ছিল। আমরা তখন জানতাম না, কিন্তু সম্প্রতি জেনেছি, আসলে তিনি আমাদের ইয়েনান অভিযানে সঙ্গী হবার জন্য কমিউনিস্টদের কাছ থেকে দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তিনি সঙ্গে থাকায় আমাদের বিশেষ সুবিধে হলো, তার ওপর তিনি চীনের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাও জানতেন। যাই হোক, আমরা শেনসি প্রদেশের রাজধানী সিয়ানে এসে পৌঁছুলে নতুন এক সমস্যা দেখা দিল। শিয়ানের কমিউনিস্ট-বিরোধী কুয়োমিন্টাং সামরিক শাসনকর্তা ভারতীয় ডাক্তারদের ইয়েনান যাওয়াটা একেবারেই পছন্দ করলেন না, আমাদের গাড়ীগুলি তিনি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিলেন। রিউই আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে আলাপ আলোচনা চালাতে লাগলেন। প্রায় তিন সপ্তাহ শিয়ানে আটকে থাকার পর অবশেষে আমরা যাত্রার অনুমতি পেলাম এই শর্তে যে, আমাদের সঙ্গের ওষুধপত্র সব সিয়ানে রেখে যেতে হবে, ইয়েনানে পৌঁছে আমাদের গাড়ীগুলোও ফেরত দিতে হবে, কমিউনিস্টদের আমরা কিছুই দিতে পারবো না। শুধুমাত্র আমাদের এক্স-রে ও অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি আমরা সঙ্গে নিতে পারলাম।

অবশেষে ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা ইয়েনানে পৌঁছোলাম। বিপুল ও আন্তরিক অভ্যর্থনায় আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম। সেখানে পৌঁছোনোর পরে পরেই আমরা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ইয়েনানের প্রচণ্ডতম শীত, গুহায় বাস করবার অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি অসুবিধে আমরা অল্পদিনের মধ্যেই কাটিয়ে উঠলাম। স্থানীয় হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতি আমাদের দেখানো হলো, তারপর সেগুলি সম্পর্কে মতামত ও সমালোচনা চাওয়া হলো। চিকিৎসার উন্নতির জন্য আমাদের অধিকাংশ মতামতকেই দ্রুত কার্যকরী করা হলো। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসা আহত সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য অষ্টম রুট বাহিনীর একটি মডেল হাসপাতাল অনেকগুলি গুহার ভেতর স্থাপিত হলো। ডঃ অটল, কোটনিস ও আমি এর সঙ্গে যুক্ত হলাম। বেসামরিক নাগরিকদেরও সেখানে চিকিৎসা হতো। ডঃ চোলকার ও মুখার্জী মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনা শুরু করলেন।

ইয়েনানে পৌঁছোবার পরের দিনই আমাদের স্বাগত জানাবার জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হলো। সমস্ত নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট নেতারাই তাতে উপস্থিত ছিলেন। স্বভাবতই চেয়ারম্যান মাওকে দেখার জন্য বিশেষ আগ্রহ ছিল আমাদের। সাধারণ যোদ্ধার বেশে তাঁকে প্রথমে তো আমরা চিনতেই পারি নি। কয়েকদিন পরে বোমাবিধ্বস্ত ইয়েনানে মাও যে গুহায় থাকতেন, সেখানে গিয়ে আমরা আবার দেখা করলাম। খানকতক সাধারণ চেয়ার, নড়বড়ে টেবিল, আর কাগজপত্র ছাড়া কিছুই নেই। দোভাষীর মাধ্যমে ভারত ও ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে তিনি অনেক প্রশ্ন করলেন। গান্ধী, নেহেরু, ভারতীয় রাজনীতি, বৃটিশকে কার্যকলাপ প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারেই তাঁর প্রচণ্ড ঔৎসুক্য দেখা গেল। খাবার টেবিলে খুবই সাধাসিধে খাবার-দাবার পরিবেশিত হলো। দেখা গেল, তিনি ও আমরা— সবাই লঙ্কার প্রতি বিশেষ অনুরাগী। তিনি ঠাট্টা করে বললেন— ''সব বিপ্লবীরাই লঙ্কা খেতে ভালোবাসে।'' এরপর অনেকবার তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। প্রতিবারই তাঁর সরলতা, আন্তরিকতা ও কৌতুকবোধ আমাদের মুগ্ধ করেছে। একবার চৌ এন্ লাই ঘোড়া থেকে পড়ে হাত ভাঙেন, তাকে ড্রেস করতে যাবার পথে ঘোড়া

থেকে পড়ে ডঃ অটলের পাঁজরের হাড় ভেঙে যায়, এর কিছুদিন বাদে আমিও কোটনিস্ ও চৌকে দেখতে যাবার পথে ঘোড়া থেকে পড়ে যাই। এই ঘটনার পর মাও তাঁর নিজের পা দু'টো দেখিয়ে ঠাট্টা করে বললেন, ''ঘোড়া হিসেবে এদের তুলনা নেই! যেখানে দরকার নিয়ে যাবে, অথচ পড়ে যাবার ভয় নেই!'' ভারতীয় মেডিক্যাল মিশন ইয়েনানে কাজ করবে— এরকম কোনো পরিকল্পনা কংগ্রেসের ছিল না। কিন্তু মিশনের সদস্যরা যখন ইয়েনানেই কাজ শুরু করলন, তখন কংগ্রেস তা মেনে নিল। ১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি পণ্ডিত নেহেরু চীনে এলেন। চুংকিং থেকে ডঃ অটলকে তারবার্তায় জানালেন— তিনি ইয়েনানে আসছেন। আমরা সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিলাম। চৌ এন-লাই সেকথা শুনে সন্দেহ পোষণ করলেন বললেন, ''চিয়াং কাই-শেক ওঁকে এখানে আসতে দেবে বলে মনে হয় না!'' ঠিক তাই-ই হলো। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার অজুহাতে নেহেরু ইয়েনানে এলেন না।

অক্টোবর পর্যন্ত আমরা ইয়েনানে রইলাম। ইতিমধ্যে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য বৃদ্ধ ডঃ চোলকার এবং কিডনির অপারেশনের জন্য মুখার্জী দেশে ফিরে গেলেন। এই সময় যুদ্ধ অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠলো। অষ্টম রুট আর্মির প্রধান কম্যান্ডের চু-তে তখন ইয়েলো নদীর ওপারে দক্ষিণ-পূর্ব শানসিতে থাই হাং পর্বতমালার গায়ে তার হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেছেন। তারও উত্তরে উ-থাই শান পর্বতমালার গায়ে (হোপেই চাহার-শানসিতে সীমান্তে অঞ্চলে) কানাডার কমিউনিস্ট ডাক্তার নর্মান বেথুন যুদ্ধক্ষেত্রেই হাসপাতাল বানিয়ে যোদ্ধাদের চিকিৎসা করছেন। চীনের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের জন্য দেশ থেকে অর্থসংগ্রহ করবার জন্য তিনি কিছুদিনের জন্য কানাডা ফিরে যাবেন, তাই আমাদেরকে বলা হলো, বেথুনের জায়গায় কাজ করবার জন্য সেখানে যেতে। প্রচণ্ড বিপদের মধ্যে তিনবার শত্রুব্যূহ ভেদ করার ঝুঁকি নিয়েও আমরা চু-তে'র হেডকোয়ার্টারে যেতে আগ্রহ দেখালাম। ডঃ অটল, কোটনিস ও আমি ছাড়াও একজন প্রগতিশীল জার্মান ডাক্তার হ্যান্স ম্যুলারও আমাদের সঙ্গে যাত্রা করলেন। পথে আমরা এক গভীর শোকসংবাদ পেলাম— মহান ডঃ বেথুন অস্ত্রোপচারের সময়ে রক্ত দূষিত হয়ে মারা গেছেন। স্বভাবতই আমরা গভীর দুঃখ পেলাম, আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। এগোবার পথে কমিউনিস্ট গেরিলা যোদ্ধাদের অসমসাহসিক বীরত্বের বিভিন্ন নিদর্শনের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটলো। সাধারণ মানুষেরাও এখানে খুব উদ্দীপিত ও সংগঠিত, প্রত্যেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। চারদিকে সবাই সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে। আমরাও সুড়ঙ্গপথে যাতায়াত করতাম। মেয়েরাও অমিতবিক্রমে পুরুষদের পাশে পাশে কাজ করছে। এমনকি শিশুরা পর্যন্ত নজর রাখছে— যাতে শত্রুর গুপ্তচর এসব সুড়ঙ্গের সন্ধান না পায়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছোবার আগের দিন রাতে দারুণ কায়দায় আমরা শত্রুব্যূহ ভেদ করাম। এক মাইল অন্তর জাপানী সৈন্যদের ঘাঁটি। গেরিলারা দু'দিকের দু'টি ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদের ব্যস্ত রাখলো, সেই ফাঁকে আমরা ডাবল মার্চ করে সারারাতে দৌড়িয়ে ভোর বেলায় এক গেরিলা ঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছোলাম। সারাদিন আমরা এতোই ঘুমোলাম যে, জাপানীদের গোলাবর্ষণেও সে ঘুম ভাঙালো না। চু-তে'র হেডকোয়ার্টারে পৌঁছোতে আমাদের একমাসের বেশি সময় লাগলো।

চু তে-কে প্রথম দেখে আমরা চিনতেই পারিনি। অপরিচ্ছন্ন এক সামরিক পোষাকে তাঁকে দেখে আমরা আর্দালি-টার্দালি কিছু কিছু ভেবেছিলাম। পরে জানলাম, তিনিই লালফৌজের বিখ্যাত নায়ক চু তে। প্রথম সাক্ষাতেই চু তে আমাদের শানসিতে কাজ করতে বললেন। আমরা তাঁকে অনুরোধ জানালাম, সমতল-ভূমিতে গেরিলা যোদ্ধাদের লড়াইয়ের কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করে যেতে চাই। চু তে একথা শুনে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করলেন। আমরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম— পাহাড়ী এলাকায় ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা গেরিলাদের সাহায্য করে, কিন্তু সমতলভূমিতে, গেরিলাদের রক্ষা করে কে? চু তে উত্তর দিয়েছিলেন— আমরাই বানিয়ে নিই— মানুষের পাহাড়— অর্থাৎ জনগণের সংগঠন।

এর কিছুদিন পরে আমরা হোপেই-চাহার-শান্সি সীমান্তে উ-থাই-শানের পাহাড়ী অঞ্চলে হাজির হলাম। ডঃ বেথুন এখানেই কাজ করতেন। তিনি যে হাসপাতালের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁর স্মরণে তার নতুন নামকরণ হয়েছিল 'আন্তর্জাতিক শান্তি হাসপাতাল'। হাসপাতালটিকে আধুনিক করে তোলার ওপরে বিশেষ জোর দেওয়া হলো। যুদ্ধক্ষেত্রের এক-দেড় মাইলের মধ্যে সেবাকার্য চালাতে গিয়ে আমরা দেখেছি— গ্রামবাসীরা কতো উদ্যোগী, তারা অস্ত্রোপচারের ঘর ঠিক করছে, গরম জল এনে দিচ্ছে, আহত যোদ্ধাদের খাওয়াবার দায়িত্ব নিচ্ছে। হাতে করে বানানো স্ট্রেচারে করে গুরুতর আহতদের চিকিৎসার জন্য নিজেরাই নিয়ে আসছে। কখনও কখনও যুদ্ধ এতো তীব্র হয়ে উঠছে যে, দিনরাত তাদের কাজ করতে হচ্ছে। এই প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যেও কিন্তু প্রায় স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন চলছে, শিক্ষা চলছে, সাংস্কৃতিক কাজ চলছে। যোদ্ধাদের মনোবলও প্রচণ্ড দৃঢ়, গুরুতর আহতরাও প্রশ্ন করছে— কবে তারা আবার যুদ্ধ করতে যেতে পারবে? এমনকি যাদের হাত বা পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে, তাদের মুখেও সেই একই প্রশ্ন। চীনা যোদ্ধা ও জনতার এই অভূতপূর্ব চেতনা ও উদ্যোগ আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে যেতো। গেরিলা যোদ্ধাদের বেশ কয়েকটি অভিযানে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়ে আমরা ভারতীদের পক্ষে অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতাও অর্জন করে নিয়েছিলাম।

সেখানে অসুবিধে ও কষ্ট ছিল ইয়েনানের চেয়েও অনেক

বেশি। বৃদ্ধ বয়সে ডঃ অটল আর এতে কষ্ট সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি দেশে ফিরে যাবেন এবং আমাদের সঙ্গে নিয়েই ফিরবেন। আমি আর কোটনিস ঘোরতর আপত্তি জানালাম— তিনি ফিরে যাচ্ছেন যান, কিন্তু আমরা থাকবো। তিনি কিছুতেই আমাদের কথা শুনতে রাজী নন। এই নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড বাদানুবাদ হয়ে গেল) তিনি একদিকে, আমি আর কোটনিস একদিকে। দোভাষীর মাধ্যমে এ খবর পেয়ে চু-তে আমাদের ডেকে পাঠালেন। সব কথা ধৈর্য ধরে শুনলেন। তারপর ডঃ অটলকে প্রশ্ন করলেন : ''আচ্ছা ডঃ অটল, আপনারা ভারতীয়রা যে বৃটিশদেরকে আপনাদের দেশ থেকে তাড়াবার জন্য এতো লড়াই চালাচ্ছেন, সেটা কী কারণে? গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য— তাই না?'' ''নিশ্চয়ই''— ডঃ অটল উত্তর দিলেন। চু-তে আবার প্রশ্ন ছুঁড়লেন, ''তাহলে এঁদের দু'জনের এখান থেকে যাবার গণতান্ত্রিক অধিকার মেনে না নেওয়াটা কি আপনার পক্ষে ঠিক হবে?'' স্বভাবতই এই চুক্তির বিরুদ্ধে ডঃ অটল কোনো প্রতিবাদ জানাতে পারলেন না। তিনি ভারতে ফিরে গেলেন, আমি আর কোটনিস থেকে গেলাম।

যুদ্ধের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পাবার পর আমরা আবার 'আন্তর্জাতিক শান্তি হাসপাতালে' কাজ করতে লাগলাম। যেখানে মাও সেতুঙের একটি তারবার্তা আমরা পেলাম— আমাদের অবিলম্বে ইয়েনানে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে। দু'মাস পায়ে হেঁটে আমি ইয়েনানে পৌঁছোলাম। কোটনিস ফ্রন্টেই রয়ে গেলেন, আন্তর্জাতিক শান্তি হাসপাতালের প্রথম পরিচালক হিসেবে। ইয়েনানে পৌঁছে আমি শুনলাম, কুয়োমিন্টাংরা জাপ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে না তুলে কমিউনিস্টদেরই বিরুদ্ধে কাজ করেছে, কমিউনিস্টদেরই এলাকার চারিদিক ঘিরে রেখেছে। মাও এই সংবাদ দিয়ে বললেন, এর পরে ভারতে ফিরে যাওয়া মুস্কিল হবে, আর তাছাড়া এমন অবস্থায় ইয়েনানে দুঃখ কষ্টও অনেক বেশ ভোগ করতে হবে, কাজেই আমার এখন দেশে ফিরে যাওয়াই ঠিক হবে। আমি জানালাম, দুঃখ-কষ্টে আমি ভয় পাই না, আমি থাকতে চাই। আবার উত্তর শুনে তিনি খুবই খুশি হলেন। তারপর আমি ইয়েনানের আন্তর্জাতিক হাসপাতালে অস্ত্রচিকিৎসকের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আমাদের তত্ত্বাবধানে আগে যে মডেল হাসপাতাল চালু হয়েছিল, এটা ছিল তারই সম্প্রসারিত রূপ। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত আমি সেখানে কাজ করলাম। ইয়েনানের রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহেও আমি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলাম। কোরিয়া, মালয়, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও ফ্যাসিবাদবিরোধী জাপানী প্রভৃতি যেসব বিভিন্ন বিদেশীরা ইয়েনানে বাস করতেন, তাঁদের সহযোগিতায় আমরা 'প্রাচ্য জাতিসমূহের ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংঘ' প্রতিষ্ঠা করলাম। চু-তে হলেন এর সভাপতি। কালক্রমে সংঘের কাজকর্ম এতো ব্যাপকতা পেল যে, স্থানীয় সীমান্ত অঞ্চলের সরকার স্থানীয় পার্লামেন্টে এই সংঘের প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার পর্যন্ত স্বীকার করেন। ১৯৪১ নভেম্বরে আমি এই সংঘের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হলাম।

ততোদিনে জাপানীরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তাদের থাবা বাড়িয়েছে, পার্লহারবারে বোমা ফেলেছে, বার্মা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। জাপান কর্তৃক ভারত আক্রমণের সম্ভাবনাও তখন দেখা দিয়েছে। এমন অবস্থায় চু-তে পরামর্শ দিলেন, এর পরে আমাদের ভারতে ফিরে যাওয়াটা অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে, আর তাছাড়া জাপানীরা ভারত আক্রমণ করলে চীনে প্রতিরোধ-যুদ্ধের যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তা কাজে লাগাবার উপযুক্ত সুযোগও পাওয়া যাবে। তাই আমাদের দেশে ফিরে যাওয়াটা উচিত হবে। আমি তাঁর যুক্তি মেনে নিয়ে দেশে ফিরে যাওয়া মনস্থ করলাম। কোটনিসকেও জানানো হলো। কোটনিসের সঙ্গে আগে আমার কথা হয়েছিল, যখন দেশে ফিরবো, দু'জন একসঙ্গেই ফিরবো। কিন্তু তা আর সম্ভব হলো না। তিনি একজন চীনা নার্সকে বিয়ে করে আন্তর্জাতিক শান্তি হাসপাতালেই কাজ করছিলেন। ১৯৪২ সালের শেষ দিকে তিনি হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। সবাই দেশে ফিরলেন, তিনিই শুধু ফিরতে পারলেন না।

ঘটনাক্রমে দেশে ফিরবার একটা ভালো সুযোগ পাওয়া গেল। একদল কুয়োমিনটাং জেনারেল আলোচনার নাম করে ইয়েনানে এসেছিলেন। আমাকে তাদের সঙ্গে আলাপ করে দিয়ে চু-তে বললেন, ''এই ভারতীয় বন্ধুটি দেশে ফিরে যাবেন। আপনাদের ওপর এঁকে নিরাপদে দেশে ফিরে যাবার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে।'' স্বভাবতই চক্ষুলজ্জার জন্য কুয়োমিনটাংরা আমার নিরাপদে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিল। তাদের সঙ্গে ইয়েনান থেকে ফিরবার সময় একটা মজার ব্যাপার ঘটলো। তারা জানতেন না যে, আমি চীনা ভাষা জানি। তাই তারা আমার সামনেই খোলাখুলি যেসব আলোচনা চালালেন, তাতে স্পষ্ট বুঝলাম, তারা আসলে গোয়েন্দাগিরির জন্যই ইয়েনানে গেছিলেন।

১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে আমি দেশে ফিরে এলাম। আসার সময় সঙ্গে চীনের পার্টির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলিল আমি নিয়ে এসেছিলাম। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা সে সবই আমার কাছ থেকে পেলেন, সারা ভারত ঘুরে আমার অভিজ্ঞতা বিবৃত করার ব্যবস্থা করলেন কিন্তু জাতীয় মুক্তির জন্য চীনের কমিউনিস্টদের অভিজ্ঞতাকে এদেশের বাস্তব

পরিস্থিতিতে কাজে লাগাবার সামান্য উদ্যোগ বা কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়নি।

যাই হোক, চীনা জনগণের প্রতি ভারতীয় জনতার মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চীনা জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে এ ধারণাই আমার হয়েছে যে, হাজার হাজার বছর ধরে এই দুই প্রাচীন দেশের বিপুল জনতার মধ্যে বন্ধুত্বের যে দৃঢ় বন্ধন রচিত হয়েছে, ১৯৩৮ সালের ভারতীয় মেডিক্যাল মিশন সেই বন্ধনকে আরও দৃঢ়তর করে তুলেছে,চীন ভারত মৈত্রীর মহান ঐতিহ্যকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। এই ঐতিহ্যকে জনগণের স্বার্থে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

পুনশ্চ : তারপর পঁয়ত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে। ভারত ও চীনের পারস্পরিক সম্পর্কের অনেক জোয়ার-ভাঁটা এসেছে, অনেক জল ঘোলা হয়েছে। কিন্তু তবুও এই দুই দেশের জনগণের মৈত্রীর হচ্ছে স্বাভাবিক প্রবণতা। ১৯৬২-র 'ভারতের চীনযুদ্ধ' এই প্রবণতার বিরোধী। এই বিরোধ কখনই চিরস্থায়ী হতে পার না। উভয় দেশের জনগণের স্বার্থেই ভারত-চীন মৈত্রীবন্ধনকে নতুন করে গড়ে তোলা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। আজকের দুনিয়ার দুই বৃহৎ শক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ভারত ও চীনের জনগণের মৈত্রী ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম আজ এক বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। এবছর চীনে গিয়ে ভারতের জনগণের প্রতি চীনা জনগণের অকৃত্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছার অজস্র প্রমাণ আমি প্রতিটি পদক্ষেপে পেয়েছি। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম ভাইস-চেয়ারম্যান ইয়ে চিয়েন-ইং তখন আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন— তিন বছর অগে চেয়ারম্যান মাও চীনে ভারতের চার্জ-দ্য-অ্যাফেয়ার্সের দিকে বন্ধুত্বের যে হাত প্রসারিত করেছিলেন, সেই হাত এখনও প্রসারিতই আছে। চীনের সরকার ও জনগণের আগ্রহ সত্ত্বেও ভারত সরকার আজ পর্যন্ত এব্যাপারে কোনোরকম কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি, যদিও মুখে লোক-দেখানো অনেক বন্ধুত্বের বাণী আউড়ে যাচ্ছে। অতীতের আক্রমণকারী জাপান পর্যন্ত আজ নিজের ভুল স্বীকার করে চীনের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত তার চীন-বিরোধী চক্রান্তের পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে, অথচ ভারত সরকার প্রধানত সোভিয়েত নয়া জারদের চাপে চীনের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নিচ্ছে না। আমরা যারা দুনিয়ার জনগণের স্বার্থেই চীন-ভারত মৈত্রীর গুরুত্ব স্বীকার করি এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটাতে চাই, তাদের সবার দায়িত্ব চীনের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য গণ-আন্দোলন ও জনমত গড়ে তুলে ভারত সরকারকে চাপ দেওয়া। এব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ না নিলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

q অনীক : ডিসেম্বর ১৯৭৩ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত

ডাঃ বিজয় কুমার বসু : জন্মশতবর্ষে ফিরে দেখা

৩৩ পৃষ্ঠার পর

মাওসেতুঙের লেখা আমরা বাংলায় ছাপতাম। 'বিপ্লবের গান' উপন্যাসটিও প্রথম আমরাই প্রকাশ করেছিলাম। স্বভাবতই আমাদের সামর্থ্য ছিল খুবই কম। ফলে প্রয়োজনমতো বই আমরা প্রকাশ করতে পারতাম না। অন্যদিকে চীনের প্রকাশন-সংস্থা গুওজি সুদিয়ান থেকে আমরা চীনের বই আনতাম, ওই সংস্থার নেপালি এজেন্টের মাধ্যমে। সেই পথেই সেসব বইয়ের দাম পাঠানো হতো। রাষ্ট্রীয় স্তরে ভারত-চীন সম্পর্ক স্বাভাবিক হবার পরে ১৯৭৮ সালে আমরা একটা পরিকল্পনা করেছিলাম। আমরা যদি 'পিপলস্ বুক এজেন্সি'-কে একটি 'সোসাইটি'তে রূপান্তরিত করি, এবং তার একটি ট্রাস্ট তৈরি করে চীন থেকে আনা সব বইয়ের দাম সেই ট্রাস্টে জমা রাখি, তবে সেই টাকা দিয়ে চীনের বিভিন্ন বই প্রয়োজনমত্রে প্রকাশ করা সম্ভব হবে। সেজন্য সবচেয়ে আগে দরকার গুওজি সুদিয়ানের সম্মতি। পরিকল্পনার কথা ডাঃ বসুকে বলতেই তিনি প্রচণ্ড উৎসাহ দেখালেন। সে বছরই তিনি আবার চীনে যাচ্ছেন। তিনি নিজেই তখন গুওজি সুদিয়ানের সম্মতির ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিলেন। সেই অনুসারে আমরা গড়ে তুললাম 'পিপলস্ বুক সোসাইটি'। তার সংবিধান ও নিয়ম-কানুন তৈরি হলো। সভাপতি হলেন ডাঃ বসু, সম্পাদক আমি। সংবিধান ও নিয়ম-কানুন নিয়ে তিনি চীনে গেলেন, প্রাথমিক সম্মতিও পেলেন। ফিরে এসে আমাদের সেকথা জানালেন। পরম উৎসাহে আমরা একের পর প্রকাশ করলাম চীন-সোভিয়েত পার্টির মতাদর্শগত বিতর্কের চারটি সংকলন। কিন্তু ১৯৭৯ থেকেই চীন সমাজতন্ত্র থেকে সরে যেতে শুরু করলো। ১৯৭৯-তে দিল্লীর আন্তর্জাতিক বইমেলায় যোগ দিতে এলেন গুওজি সুদিয়ানের দুই প্রতিনিধি। তারা কলকাতায় এলেন, তাদের চিঠি পেয়ে আমরা তাদের সাথে দেখা করলাম। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন : তারা বই প্রকাশ করেন ব্যবসার জন্য, রাজনীতির সঙ্গে সেই ব্যবসার কোনো সম্পর্ক নেই। স্বভাবতই আমরা স্তম্ভিত, কিন্তু কিছু করার নেই। আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাটিই বরবাদ করে দিতে হলো। মনে আছে, সব শুনে ডাঃ বসু প্রচণ্ড অবাক হয়েছিলেন। তখনই তিনি প্রকাশ করেছিলেন চীনের রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক সংশয়ের কথা।

আজকে চীন পুরোটাই প্রায় সরে গেছে সমাজতন্ত্রের ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার পথ থেকে। কিন্তু তাই বলে চীনের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের মৈত্রী গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় নি। বরং নতুন পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশে দেশে ক্রমবর্ধমান লড়াইয়ের পটভূমিকায় দুনিয়াজোড়া যে ঐক্য গড়ে তুলতেই হবে, তার স্বার্থেই নতুনভাবে দু'দেশের জনগণের মধ্যে মৈত্রীর সেতুবন্ধন দরকার হবে। সেই কাজে ডাঃ বসুদের মতো পূর্বসূরীদের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা অবশ্যই অমলিন থেকে যাবে।

পাঠকের কলমে

'বিদ্যাস্থানে ভয়' নিয়ে পাঠকদের ভয়!

মাননীয় সম্পাদক,

অনীক পত্রিকার পড়ছি অন্তত বছর কুড়ি ধরে। পড়ি, কারণ না পড়ে পারি না, কারণ ঠিক এরকম আর কোনো পত্রিকা বাংলায় আছে কি না জানি না। একটি ক্ষীণকলেবর পত্রিকা কিভাবে একটি বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত করে চলেছে। যতদূর জানি যে, কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থেকেই এবং প্রায় বিনা বিজ্ঞাপনে এবং নিয়মিতভাবে এই পত্রিকা আমাদের সামনে তারই একটা মডেল। *অনীক*-এর সব বক্তব্যের সাথে যে মতের মিল হয়, তাও নয়, তবু *অনীক* যা বলে, তা গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে বাধ্য হই। সমকালীন বিভিন্ন ঘটনাবলীকে *অনীক* যেভাবে বিশ্লেষণ করে, তা আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পথ দেখায় এবং ভাবতে বাধ্য করে।

সেই কারণেই *অনীক*-এর কোন লেখা যখন *অনীক*-এর দৃষ্টিভঙ্গীরই উল্টো পথে হাঁটে, তখন খারাপ লাগে, নানারকম দুশ্চিন্তা করতে বাধ্য হই। এরকমই একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে অনীকের মার্চ, ২০১২ সংখ্যায়। লেখাটির নাম 'বিদ্যাস্থানে ভয়', লিখেছেন মালবিকা সাহা। এমনিতে লেখাটি বেশ ভালো, মাত্র কয়েক মাস ক্ষমতায় বসেই মমতা সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে যেভাবে চরম নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা ও দলতন্ত্রের জন্ম দিয়েছে, তার চমৎকার তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ ও আলোচনা। কিন্তু এটা তো *গণশক্তি* বা *আজকাল*-এর উপযুক্ত লেখা, এটা *অনীক*-এ কীভাবে প্রকাশিত হলো, সেটাই বুঝতে পারছি না।

কারণ, ভেবে দেখুন, শিক্ষার যে যে দিকে বিশেষ করে দলতন্ত্রের প্রাধান্য বর্তমান সরকার মূলত গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এর আগে কি সেখানে দলতন্ত্র ছিল না? ছিল এবং সর্বাত্মকভাবেই ছিল— বর্তমান সরকার ও শাসক দল আসলে আগের বামফ্রন্ট অর্থাৎ সিপিএম-এর পদাঙ্কই অনুসরণ করছে। মুস্কিল হচ্ছে, তৃণমূল নামের দলটি সাংগঠনিকভাবে এতই বিশৃঙ্খল ও নীতিহীন যে তারা সেই কাজটা করছে নিতান্তই স্থুলভাবে ও বোকার মত। তাই প্রথম থেকেই তা নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে এবং প্রতিবাদের ঢেউ উঠছে। অন্যদিকে সিপিআইএম মোটামুটি আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কিছু ভাল কাজ করলেও, ধারাবাহিক ক্ষমতার আস্বাদ তাদের ক্রমশ বেশি বেশি লোককে নীতিভ্রষ্ট, দুর্নীতিগ্রস্থ ও উদ্ধত করে তোলে। তখন থেকে তারা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নিজেদের সংগঠনকে মাকড়সার জালের মত ছড়িয়ে দেয়। ভয়, লোভ বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে তারা অন্যদের কণ্ঠরোধ করে ফেলে, ক্রমশ প্রতিবাদের ভাষাই স্তব্ধ হয়ে আসে। ফলে বাহ্যত, শান্তিপূর্ণভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে সব সব জায়গায় তাদের প্রায় নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে *অনীক*-এর লেখা পড়েই আমরা সবচেয়ে বেশি সচেতন হয়েছি। অথচ সেই *অনীক*-এই এমন লেখা প্রকাশিত হল, যা পড়ে মনে হবে, বর্তমান সরকারের আগে এই রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে যেন স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই *অনীক*-এই সিপিএম জমানার এইসব সর্বাত্মক আগ্রাসী মানসিকতা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় কবি শঙ্খ ঘোষ অভিহিত 'ক্ষমতামদমত্ততা' শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হতে দেখেছি। *অনীক* বা তার লেখকেরা কি তাঁদেরই সেই দীর্ঘদিনের অবস্থান থেকে সরে আসতে চাইছেন?

এই প্রশ্নের উত্তর অনীকের দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে কি আমি দাবী করতে পারি না?

বিনয়ভূষণ বসু কৃষ্ণনগর। নদীয়া

❑ লেখকের সংযোজন

শ্রীবিনয়কুমার বসুকে ধন্যবাদ আমার লেখাটি সম্পর্কে সুচিন্তিত সমালোচনা করার জন্য। তবে তাঁর উত্থাপিত অভিযোগ আমি মূলত মেনে নিতে পারছি না । কারণ আমার লেখায় আমি কখনোই এমন কোনো ইঙ্গিত দিই নি, যা থেকে মনে হতে পারে পূর্ববর্তী জমানায় 'রামরাজ্য' বিরাজ করতো।

বর্তমান শাসকদের স্থুল (কিন্তু আমার মতে, মোটেই তা বোকার মতো নয়, বরং বামফ্রন্টের মতোই শিক্ষায় বিশ্বায়ন চালু করার সুচিন্তিত পদক্ষেপ) এবং আপাত-বিশৃঙ্খল অবস্থাটি যে নৈরাজ্যের জন্ম দিতে যাচ্ছে, আমার 'বিদ্যাস্থানে ভয়' নিবন্ধটি তার বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ ছিল। আমার নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'শিশু পরিবর্তনকে আর একটু সময় দেবার' যে বাজারী তত্ত্বে এখন পশ্চিমবঙ্গ মুখরিত, সেই বিপজ্জনক তত্ত্বের বিরোধিতা করে দেখানো যে, এখনকার 'সুন্দর সকাল'টি আগামীর 'ভয়ঙ্কর রাত্রি'র পূর্বাভাস।

আর বর্তমান অবস্থার সমালোচনা করতে গিয়ে সর্বদাই বিগত ৩৪ বছরের নৈরাজ্যের নিন্দা দিয়ে শুরু করতে হবে, নাহলেই 'অনীক'-এর পাঠকেরা ভুল বুঝবেন—এ যুক্তি আমার কাছে খুব একটা বোধগম্য নয়। প্রথমত, 'অনীক'-এর মান্যতা অতো ঠুনকো নয়। দ্বিতীয়ত, আমার নিবন্ধেই যথেষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, যা বামফ্রন্ট সম্পর্কে এই পত্রিকার এতোদিন অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গি যে পাল্টে যায় নি, তার প্রমাণ বহন করে। যেমন, আমি স্পষ্টতই বলেছি : 'সুশাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বাম-নামধারী দুর্বৃত্তদের হাতে পড়ে গণতান্ত্রিক কাঠামোর যে দুর্দশা ঘটেছিলো, সেই ক্ষোভকে পুঁজি করে তৃণমূল ডান্ডাধারীরা হয়ে উঠেছে তাদের চেয়েও এক কাঠি উপরে।' যেমন, বর্তমান জমানায় অস্থায়ী শিক্ষকদের বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে আমি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছি : 'পূর্বতন বাম সরকার ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন।'

তবুও যদি বিনয়বাবুর মনে হয় যে, আমার নিবন্ধটি পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী, তাহলে সম্ভবত আমার প্রকাশভঙ্গিতেই দুর্বলতা ছিল। তবে একটাই বিনীত প্রশ্ন: পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী সেরকম মনে করলে কি লেখাটা আদৌ ছাপতেন?